কারাগারের চিঠি

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা رحمه الله

অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল হাসান

গভীর জ্ঞানের অধিকারী এই মহান মনীষী চাইলেই পারতেন কিতাবের ইলমের মাঝেই নিজের বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখতে। কিংবা শাসকশ্রেণীর মতের সাথে সহাবস্থানে থেকে শান্তিময় বিলাসী জীবনযাপন করতে। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন কণ্টকাকীর্ণ নববী পথ। কেবল জালিম শাসকের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ করেই থেমে থাকেননি, বরং তাতার সম্রাট গাযানের বিরুদ্ধে সরাসরি জিহাদেও অংশ নিয়েছেন। মিথ্যা অভিযোগের দায়ে বারবার জেলে গিয়েছেন, কিন্তু থেমে থাকেননি। জেলের মধ্যে বসেই লিখেছেন আকিদা, ফিকহ, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-সহ অসংখ্য বিষয়ের গ্রন্থ। বাতিলপন্থীদের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠা চিঠির মাধ্যমে। কাফির শাসকদের নিকটও পাঠিয়েছেন, দাওয়াহ ও হুশিয়ারিমূলক পয়গাম। এই মহান ব্যক্তির কারাজীবনের ঐতিহাসিক চিঠিসমূহের এক অনবদ্য সংকলন এই বই—কারাগারের চিঠি।

কারাগারের চিঠি

কারাগারের চিঠি

লেখক

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ﷫

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আব্দুল্লাহ আল হাসান

কারাগারের চিঠি

facebook.com/ nusus-publication

ISBN : 978-984-8041-92-5

প্রকাশক : নুসুস পাবলিকেশন

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বইবাজার.কম, তারিকজোন

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২১০৳

পরিবেশক
দারুন নাহদা
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, ২য় তলা, বাংলাবাজার
০১৭৩৯ ১৫২১৯৭

মাকতাবাতুন নুর
ইসলামি টাওয়ার ২য় তলা, বাংলাবাজার

সূচিপত্র

রিসালাহ-৭

রিসালাহ-৮

রিসালাহ-৯

রিসালাহ-১০

রিসালাহ-১১

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

হকপন্থী আলেমদের সাথে জালিম শাসকগোষ্ঠীর সব সময় দা-কুমড়া সম্পর্ক থাকে। নানা নির্যাতন, নিপীড়ন আর হুমকিধামকি চলতে থাকে সত্যপন্থীদের ওপর। ইমাম আবু হানিফা থেকে নিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা পর্যন্ত—সব যুগের চিত্র একই। কিন্তু শত অত্যাচার-জেল-জুলুম সত্যপন্থীদের টলাতে পারে না বিন্দুপরিমাণও। অত্যাচারের মাত্রা যত বেশি হয়, সৎপথকে আঁকড়ে ধরার স্পৃহা তাদের মধ্যে আরও মজবুত হতে থাকে।

ইবনে তাইমিয়্যা এমন এক মহান ব্যক্তির নাম, যে নাম বাদ দিলে ইসলামি-ইতিহাস অপূর্ণই রয়ে যাবে। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভার নাম ইবনে তাইমিয়্যা। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, সামসময়িক জ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। এই মহান ইমামের সাথেও ঠিক একই আচরণ করা হয়েছে, যা করা হয়েছিল ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵏-এর সাথে।

বাতিলপন্থী ও বিদআতিরা যখন দালিলিকভাবে তার ফাতাওয়ার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন শাসকদের ফুঁসলিয়ে তাকে বন্দি করার মাধ্যমেই সমাধান খুঁজে নিয়েছে ওরা। কিন্তু সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন আপসহীন। আর এই আপসহীন মানসিকতার কারণে অসংখ্যবার বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছে

তাকে। এমনকি শেষমেশ তার লাশটাও বেরিয়েছে কারাগার থেকেই। কিন্তু কারাগারের চার দেয়াল দমিয়ে রাখতে পারেনি ইবনে তাইমিয়্যাকে। তার বিখ্যাত কিছু কিতাব ও রিসালাহ (পত্র) রচিত হয় এই কারাগারের অভ্যন্তরেই।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি তার কারাগারের রিসালাহ-সমূহের সংকলন। গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা رسائل من السجن، دار طيبة، الرياض নুসখাটি সামনে রেখেছি। এই নুসখায় থাকা মুহাম্মাদ আবদাহ-এর লিখিত বিশাল ভূমিকাটির পরিবর্তে ইবনে তাইমিয়্যা'র একটি তথ্যবহুল জীবনী যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে করে পাঠক এই মহান ইমামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করবে। অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ছাড়া কোনো কিছুই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই বোদ্ধা পাঠকের নিকট যদি অনুবাদজনিত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তা জানানোর অনুরোধ রইল। ভুল সংশোধনের জন্য আমরা সর্বদাই প্রস্তুত ইন-শা-আল্লাহ।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁকে অনুসরণ করবে, তাদের সকলের ওপর।

বিনীত
আব্দুল্লাহ আল হাসান

ইবনে তাইমিয়্যার জীবনী

৬৯৯ হিজরি। ইতিমধ্যে মাহমুদ গাযানের সাথে যুদ্ধ হয়েছে সুলতান নাসির মাহমুদের। পরাজিত হয়েছেন সুলতান। নিহত হয়েছেন প্রতিরক্ষা প্রধান, আমির, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর-সহ অনেক সাধারণ মানুষ। সুলতান প্রাণ নিয়ে ফিরছেন কোনোমতে। তাতাররা তখন একের-পর-এক ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম উম্মাহর ওপর। মুসলিম-বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছিল তাতারভীতি। তাতারদের মোকাবিলা করা তো দূরের কথা, ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করছিল না কেউ। এমন সময় একজন আওয়াজ তুলে বললেন, "আমি তাতার সম্রাটের সাথে দেখা করে বিস্তারিত কথা বলব।" কিছু আলেমদের সঙ্গে নিয়ে গাযানের সাথে দেখা করতে গেলেন তিনি।

গাযান জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা?" জবাব দেওয়া হলো, 'ওরা দামেশকের শ্রেষ্ঠ আলেম।" গাযান তাদের ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। আলেমদের সামনের সারিতে আছেন মাঝবয়েসী একজন। তিনিই প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে মাহমুদ গাযান ভীত হয়ে উঠল। প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল ওই আলেমের চোখে। কথা বলা শুরু করলেন ওই মাঝবয়েসী আলেম। তার কণ্ঠ উঁচু হতে থাকল কথা বলার সময়। গাযানের হাঁটুর সাথে তার হাঁটু লেগে যাচ্ছিল। সাথিরা এই অবস্থা দেখে ভীত হলেন। তারা মনে মনে ভাবছিলেন, এই বুঝি আর রক্ষে নেই। আজ হয়তো জীবন নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারব না। গাযান আমাদের এখানেই হত্যা করবে।

কিন্তু ওই মাঝবয়েসী আলেম কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তার কথা চালিয়ে গেলেন। গাযানকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "তুমি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছ? তোমার সাথে জ্ঞানী, কাজি ও সৈন্য আছে, আর তুমি কিনা তাই দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছ! ইসলাম কবুল করার পরেও বিশ্বাসঘাতকতা করছ মুসলিমদের সাথে।"

কথাগুলো বলার সময় প্রতিশোধের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছিল ওই আলেমের চোখে-মুখে। গাযান ছিল হতভম্ব। তার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই আলেমের সামনে সে কিছুই বলতে পারছিল না। কথাবার্তা শেষ হলে তাতার সম্রাট প্রতিনিধি-দলকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। কিন্তু সে আলেম কোনো খাবারেই হাত না দিয়ে চুপ করে উঠে গেলেন। তিনি বললেন, "আমি এই খাবার কিছুতেই গ্রহণ করব না। এগুলোতে মুসলিমদের রক্ত লেগে আছে।"

খাবার খেতে খেতে তার সাথিরা ভাবছিল, "এই শেষ! গাযান এখনই আমাদের হত্যা করবে।" কিন্তু নির্ভিক ছিলেন ওই আলেম। একটুও বিচলিত হননি গাযানের সামনে। উপস্থিত সভাসদরা অবাক হচ্ছিল এমন নির্ভিক মানুষটিকে দেখে। তিনি বলতেন, "সৃষ্টিকে কেবল সে-ই ভয় করতে পারে, যার অন্তরে রোগ আছে।"

এই আলেমের নামই হলো ইবনে তাইমিয়্যা ﷬। পুরো নাম তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল কাশেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তাইমিয়্যা আল হার্‌রানি। ৬৬১ হিজরির (১২৬৩ খ্রিস্টাব্দ) দশ রবিউল আউয়্যাল উত্তর ইরাক ও শামের মাঝামাঝি অবস্থিত হার্‌রান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শায়খ আবদুল হালিম ﷬ ছিলেন ওই সময়কার একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দিস। তার দাদা মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ﷬ ছিলেন হাম্বলী মাজহাবের ইমাম। কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ফিকহে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য।

ইবনে তাইমিয়্যা জন্মেছিলেন এক অস্থির সময়ে। তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই গোলযোগপূর্ণ। তার জন্মের ৫ বছর আগেই তাতারদের হাতে পতন ঘটেছিল খিলাফার রাজধানী বাগদাদের। এ সময় চলছিল হিজরতের কাফেলা। ইবনে তাইমিয়্যার বাল্যকালেই তার পরিবার হার্‌রান থেকে হিজরত করে চলে আসে দামেশকে। এই সফরে ইবনে তাইমিয়্যা বিভিন্ন এলাকার নিপীড়িত মুসলিমদের দেখা পান। উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র থেকেই বিপ্লবী চিন্তাধারা জন্ম নিয়েছিল তার মানসপটে।

সে সময় বিভিন্ন শহরে দরস দিতেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ। আর ইবনে তাইমিয়্যা সে-সকল আলেমদের দরসে বসতেন। তিনি নির্দিষ্ট কোনো আলেমকে অনুসরণ করার বদলে সবার থেকেই জ্ঞান আহরণ করা শুরু করেন। তার জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রচণ্ড, মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। নতুন যা সামনে আসত,

তা-ই তিনি আয়ত্ত করে ফেলতেন। সে সময় আকীদা ও ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের নিয়েই পড়াশোনা হতো বেশি। তবে ইবনে তাইমিয়্যা বেশি স্বাদ অনুভব করতেন তাফসীর অধ্যয়নে। এটি ছিল তার প্রিয় বিষয়। তিনি বলেন, "আমি একেকটি আয়াতের তাফসীর কমপক্ষে একশো তাফসীরের কিতাব থেকে পড়তাম। তারপর আল্লাহর কাছে আমার মেধা বৃদ্ধির জন্য দুআ করতাম। আল্লাহকে বলতাম, হে আদম ও ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে ইলম দান করুন। আমি মসজিদে চলে যেতাম, মাটিতে সিজদা করে বলতাম, হে ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে জ্ঞান দান করুন।

ইবনে তাইমিয়্যার কিছু বৈশিষ্ট্য

১. তিনি ছিলেন উম্মাহর শিক্ষক ও নেতা। তিনি জনসাধারণের-পক্ষ-থেকে-আগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শাসকের মুখোমুখি হতেন। তার দৃঢ়তা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণেই দামেশকের জনসাধারণ যে-কোনো সিদ্ধান্তের জন্য তার দিকেই চেয়ে থাকত। ফলে তিনি হিংসুকদের রোষানলে পড়েন। একসময় তাকে দামেশক ছেড়ে মিশর চলে যেতে বাধ্য করা হয়। তিনি কখনও ব্যাবসা-বাণিজ্য বা কোনো পার্থিব ব্যস্ততায় ব্যস্ত হননি। তার পুরোটা সময় কাটত ইলম অর্জন, শিক্ষাপ্রদান ও জিহাদের ব্যস্ততায়। দ্বীনি বিষয়ে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে চিরকুমারই থাকতে হয়েছে তাকে।

তিনি যখন শরয়ী রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন, তখন মুসলিমদের সমস্যাবলীর কথা তুলে ধরতেন। তিনি লিখেছেন, কোনো সভ্যতার সমৃদ্ধি নির্ভর করে ন্যায়পরায়ণতার ওপর। আল্লাহ ওই রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যার ভিত্তি ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও তা কাফির রাষ্ট্র হয়। কিন্তু তিনি জুলুমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রকেও সাহায্য করেন না।

তিনি জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েও ভাবতেন। তিনি লিখেছেন, শাসকদের জন্য আবশ্যক হলো মানুষকে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য করা।

২. তিনি ছিলেন একজন বীর মুজাহিদ, যিনি তাতারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে। মাহমুদ গাযানের বাহিনী যখন দামেশক আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছিল তখন শহরবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা শহর ছেড়ে পালাতে চাইছিল। তখন ইবনে তাইমিয়্যা এগিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে

সংগঠিত করেন। জনসাধারণকে সাহস দিয়ে বলেন, এই যুদ্ধে আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তার কথার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ায় জনতা। তাতারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় সবাই। তাতাররা পরাজিত হয়।

৩. ইবনে তাইমিয়া ছিলেন একজন যুগ-সচেতন আলেম। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। সমকালীন জনজীবনের ওপর তার গভীর পর্যবেক্ষণ ছিল। সামসময়িক এমন কোনো সমস্যা ছিল না, যার বিরুদ্ধে কলম ধরেননি তিনি। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রীক দর্শন আরবিতে অনূদিত হয়। এরপর মুসলিম বিশ্বে ক্রমান্বয়ে এর প্রভাব বাড়তে থাকে। মুসলিমদের আকীদা-বিষয়ক মৌলিক নীতিগুলোও প্রভাবিত হতে থাকে। ঈমান-বিধ্বংসী বিভিন্ন শাস্ত্রকে ইসলামি আকীদার অংশ বানিয়ে ফেলা হয়। ইবনে তাইমিয়া খুব শক্তহাতে এর মোকাবিলা করেন। গ্রিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার ওপর *"আর-রদ্দু আলাল মানতিকিয়্যিন"*, শিয়া ফিতনা নিয়ে বিশাল কলেবরের *"মিনহাজুস সুন্নাহ"*, খ্রিষ্টধর্মের আলোচনায় *"আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ"*, ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ওপর *"আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ"*-সহ অনেক প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেন। তার ফাতাওয়ার সংকলন নিয়ে ৩৮ খণ্ডের *"মাজমাউল ফাতাওয়া"* প্রকাশিত হয়েছে, যা ইসলামি আইনশাস্ত্রে এক অনন্য সংযোজন। সম্প্রতি তার লেখা "আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল" নামক কালজয়ী কিতাবটির মুখতাসার "নুসুস" পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. তার সকল রচনাকে একত্র করলে অন্য এক ইবনে তাইমিয়ার চিত্র ভেসে উঠবে। এটি এমন এক চিত্র, যার সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়। তার রচনায় দেখা মিলে মেধার প্রখরতার। প্রতিপক্ষরা তার সাথে কোনো বিতর্কেই জয়ী হতে পারেনি। আলোচনা করার সময় কখনও রাগের বশে ভুলভাল ব্যাখা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেননি তিনি। যা বলেছেন, দলিলের ভিত্তিতেই বলেছেন। কথা বলার সময় ইনসাফের পরিচয় দিতেন তিনি। আমরা যদি ইতিহাসে ফিরে তাকাই এবং তার কর্মকাণ্ডের দিকে নজর দিই তা হলে দেখব—তিনি তার কর্মের দ্বারা নিজেকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। একদিকে তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস। অপরদিকে তিনি ছিলেন মর্দে মুজাহিদ ও মুজাদ্দিদ। তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহর দ্বীনের জন্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তিনি কেন বন্দি হয়েছিলেন?

ভুল ফাতাওয়া কিংবা কোনো বিদআত প্রচলনের জন্য তাকে বন্দি করা হয়নি। কেননা সামসময়িক সব উলামারাই তার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি তার প্রধান প্রতিপক্ষ ও বিশিষ্ট আলেম কাজি যামালকানি বলেন, "আল্লাহ ইলমকে ইবনে তাইমিয়্যার নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছিলেন, যেভাবে দাউদ ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছিলেন লোহাকে।" তিনি আরও বলেন, "বিগত পাঁচ শতাব্দীতে তার মতো কোনো আলেম জন্ম নেননি।"

ইমাম যাহাবি ﷺ বলেন, "তিনি যে হাদীস জানেন না, সেটা হাদীসই না।"

ইমাম ইবনে দাকিকুল ঈদ ﷺ বলেন, "ইবনে তাইমিয়্যার সাথে সাক্ষাতের পর আমি বুঝতে পারলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা ছিল তার নখদর্পণে।"

জ্ঞানগত কোনো দুর্বলতা বা ভুল ফাতাওয়ার কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাকে বন্দি করা হয়েছে—এ কথা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। বরং তার কিছু ফাতাওয়া স্থানীয় উলামাদের মতামতের বিপরীত হয়। ফলে জ্ঞানের যুদ্ধে নামার পরিবর্তে তাকে বন্দি করার মধ্যেই সমাধান খুঁজে নেয় প্রতিপক্ষরা। ইমামের বিরুদ্ধে নানান কুৎসা রটনা করতে থাকে। সুলতানের কাছে ইমামের নামে মিথ্যাচার করা হয়। ফলে সুলতানের আদেশে ইমামকে দামেশকের কেল্লায় বন্দি করা হয়। এ ছাড়াও তিনি কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার কারাগারেও বন্দি ছিলেন। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কারও বিরুদ্ধেই কোনো পদক্ষেপ নেননি তিনি। যাদের কারণে তিনি কারাবরণ করেছিলেন, তাদের সবাইকে বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেন। তাদের কল্যাণের জন্য দুআ করেন। এর মাধ্যমে ইমামের এক মহানুভব চরিত্র ফুটে ওঠে আমাদের সামনে।

কারাগারে তার সময় কাটত লেখালেখি ও তিলাওয়াত করে। কিন্তু সেটাও সহ্য হয়নি অনেকের। কারণ, তিনি যা-ই লিখতেন, জনগণের মাঝে তা-ই ছড়িয়ে পড়ত বাতাসের বেগে। বাইরে থাকা অবস্থায় জনসাধারণের মাঝে তার যত গুরুত্ব ছিল, কারাগারে থাকা অবস্থায় সে গুরুত্ব যেন আরও বাড়তে থাকল। ফলে অনেকের গা-জ্বালা শুরু হয়। এক পর্যায়ে ইমামের কাছ থেকে কাগজ ও কলম ছিনিয়ে নেয়া হয়। ফলে জেলখানার কয়লা দিয়ে লেখালেখি করেন। শেষমেশ কয়লা সরবরাহ করাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারাগারের বাকি দিনগুলো আল্লাহর যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত হয় তার। কারাগারে থাকা অবস্থাতেই ৭২৮ হিজরিতে (১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন তিনি। আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা প্রথমবার কারাবাসের সময় মিসর থেকে তার মায়ের কাছে এই পত্র লেখেন। পত্রে তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মায়ের সান্নিধ্য পাবার আকুলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন, মায়ের সান্নিধ্য তার অতি প্রিয়। কিন্তু দ্বীনি কারণে বাধ্য হয়েই মা-কে ছেড়ে সুদূর মিসরে অবস্থান করতে হচ্ছে তাকে।

রিসালাহ-১

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার মায়ের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে প্রিয় মায়ের প্রতি।

আল্লাহ তাআলা তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দিয়ে আপনার চক্ষুকে শীতল করুন এবং পূর্ণ নিয়ামত দান করুন, আপনাকে তাঁর সর্বোত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পরসমাচার এই যে, আমি আপনার নিকট মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করছি যার কোনো শরীক নেই, কোনো অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই প্রশংসার যোগ্য, তিনি সকল বিষয়ের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আমি আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করছি, যেন তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল—সর্বশেষ নবী ও মুত্তাকীদের ইমাম—মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর শান্তি ও রহমত নাযিল করেন।

আমি আপনার নিকট এই পত্রটি লিখছি আল্লাহ তাআলার অসীম ও অপার নিয়ামতের বিবরণ দেওয়ার জন্য, তার সীমাহীন দয়া এবং অনুগ্রহের কথা আলোচনা করার জন্য। এ জন্য আমি মহান রবের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করছি।

আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত প্রতিনিয়ত আমাদের ওপর বয়ে যাচ্ছে। যা কখনও শেষ করা যাবে না। প্রিয় মা! আপনি জানেন, এই শহরে আমাদের উপস্থিতি কতটা জরুরি! বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে (আপাতত আমাকে) এখানেই থাকতে হচ্ছে। কেননা আমরা যদি এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও উদাসীনতা দেখাই কিংবা শিথিলতা-প্রদর্শন করি, তা হলে আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার মাপকাঠি

উলট-পালট হয়ে যাবে এবং শরীয়তের ভিতগুলো উইপোকায় খেয়ে দুর্বল করে ফেলবে।

আল্লাহর শপথ! আমি ইচ্ছে করে আপনাকে ছেড়ে এখানে অবস্থান করছি না; যদি পাখিরা আমায় উড়িয়ে নিয়ে যেত, তবে আমি এখনই চলে যেতাম আপনার কাছে। কিন্তু (এখান থেকে চলে) না যাওয়ার পেছনে আমার কিছু অপরাগতা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যদি জানতেন, তবে এই মুহূর্তে আপনিও আমার মতোই (এখানে থেকে-যাওয়ার) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

(বিনা কারণে) আমি এক মাসও এখানে অবস্থান করার পক্ষপাতী নই; তাই তো প্রতিদিন আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ইসতিখারা করে যাচ্ছি এবং কল্যাণ ও সফলতার দুআ করছি। মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য যা কল্যাণকর, তার ফয়সালা করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এই জমিনে কল্যাণ, রহমত ও বরকত ও হিদায়াতের দরজা যেভাবে খুলে দিয়েছেন, তা আমাদের অন্তর কখনও কল্পনা করেনি এবং আমাদের চিন্তাতেও কখনও আসেনি।

আমরা তো আল্লাহ তাআলার নিকট ইসতিখারা করে সফরে সফরে সময় কাটাই। প্রিয় মা! আপনি এমন ধারণা করবেন না যে, আমি আপনার স্নেহের পরশ ও বরকতময় সান্নিধ্য ছেড়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। শরীয়তের দৃষ্টিতে যেগুলো আপনার সান্নিধ্য ও নৈকট্যের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন আমি ওই সকল বিষয়কে কখনোই আপনার সান্নিধ্য ও নৈকট্যলাভের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিই না। কিন্তু এখানে এমন অনেক জরুরি ব্যস্ততা রয়েছে—আমরা যদি এগুলোর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ি—তা হলে বড় ধরনের ক্ষতি এবং ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে। আর উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখে এবং অনুভব করে, অনুপস্থিত ব্যক্তি সেটা দেখেও না এবং অনুধাবনও করে না।

আপনার প্রতি অনুরোধ রইল, আমাদের কল্যাণের জন্য দুআ করবেন। কেননা আল্লাহ তাআলাই সবকিছু জানেন। তিনি জ্ঞানী আর আমরা তো অজ্ঞ, কিছুই জানি না। তিনিই সবকিছু নির্ধারণ করেন, আর আমরা (তাঁর হুকুমের বাইরে) কিছুই করতে পারি না। এবং তিনিই মানুষের কল্পনাযোগ্য জগতের বাইরের বিষয়ের জ্ঞানী, অন্তর্যামী। নবী ﷺ বলেন,

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ
اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ

"আদম-সন্তানের জন্য আল্লাহ যা ফয়সালা করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হলো তার সৌভাগ্য। আর আল্লাহ তাআলার নিকট কল্যাণ-প্রার্থনা করা ছেড়ে দেওয়াই হচ্ছে তার দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ওপর নাখোশ হওয়াও তার দুর্ভাগ্য।"[১]

ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী কখনও কখনও পণ্যসামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, ফলে সে কিছুদিন সফর মুলতবি করে এবং সুযোগ বুঝে আবার যাত্রা শুরু করে। আমরা যে ভয়াবহ পরিস্থিতি পার করছি, সেটা বর্ণনা করে বোঝানোটাও (আমার পক্ষে) সম্ভব নয়! নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

আপনি-সহ, পরিবারের ছোট-বড়, পাড়া-পড়শি, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী— প্রত্যেকের প্রতি আল্লাহ তাআলার অগণিত রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবি ও সত্যানুসারীদের ওপর।

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান : ২১৫১; হাসান।

৭০৬ হিজরিতে প্রথমবারের মতো কারাগার থেকে মুক্তি পান ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা। মুক্তির পর কায়রোর নায়েবে আমির তাকে থেকে যেতে বলেন। ইবনে তাইমিয়্যা এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। তিনি চাচ্ছিলেন স্থানীয়দের মাঝে ইলম প্রচার করতে এবং তাদেরকে সালফে সালেহীনের পথে ডাকতে। মিশরে অবস্থানকালে ইবনে তাইমিয়্যা দামেশকে তার বন্ধুদের কাছে এই পত্র লিখেন। এই পত্রে দেখা যায়, তিনি তার শত্রু ও বিরোধীদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের অনুরোধ করেন কেউ যেন ভিন্ন মানসিকতা-লালনকারী কারও ওপর জুলুম না করে। এই পত্রের ছত্রে ছত্রে ইমামের ইনসাফ ও মহানুভবতা ফুটে উঠেছে।

রিসালাহ-২

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে অসংখ্য নেয়ামত, এবং অশেষ অনুগ্রহে সিক্ত করেছেন। যার ফলে আমার জন্য জরুরি হলো আল্লাহর আনুগত্য করা ও বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং ধৈর্যধারণ করা। আর দুঃখ ও কষ্টে থাকা অবস্থায় ধৈর্যধারণের চেয়ে সুখ ও সাচ্ছন্দের সময় বান্দার বেশি বেশি সবর করা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ

"আর আমি যদি মানুষকে আমার অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, পরে তার থেকে থেকে তা নিয়ে নিই; তা হলে সে ভীষণ হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।"[২]

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

"আর যদি তার ওপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখ আস্বাদন করাই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার দুরাবস্থা কেটে গেছে। আর সে আনন্দে আত্মহারা ও অহংকারী হয়।"[৩]

إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

[২] সূরা হুদ, ১১ : ৯
[৩] সূরা হুদ, ১১ : ১০

"তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।"[৪]

কারাগারে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করেছেন। তাঁর করুণার মাধ্যমে তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তাঁর কালিমাকে সুউচ্চ করেছেন। তাঁর বান্দা এবং মুজাহিদদের বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। তাঁর ওলি-আউলিয়াদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে শক্তিশালী করেছেন। বিদআতি ও ভ্রান্ত-মতাবলম্বীদেরকে পরাস্ত করেছেন। তিনি সুন্নাহকে শক্তিশালী করেছেন, হিদায়াতের নূরকে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ এত বেশি মানুষের সামনে হককে প্রকাশ করেছেন, যার সঠিক সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন লোকজন দলে দলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দিকে ফিরে আসছে। বর্তমানে আল্লাহ আমাদেরকে (না চাইতেই) এমন সব নিয়ামত দান করছেন, যা অর্জন করার জন্য অনেক ধৈর্য ও শুকরিয়ার প্রয়োজন হয়।

দ্বীনের একটি মূলনীতি হলো—মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় করা। তাদের মধ্যকার বিভেদ দূর করা। তাদের অন্তরগুলোকে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যকার বিবাদকে সংশোধন করো।"[৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

[৪] সূরা হুদ, ১১ : ১১

[৫] সূরা আনফাল, ০৮ : ০১

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত-প্রাপ্ত হও।"[৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আর তাদের মতো হোয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও মতভেদ করেছিল। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[৭]

এমন আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে ও পরস্পরের মধ্যকার মেলবন্ধন তৈরি করতে এবং সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি ও মতানৈক্য পরিহার করার আদেশ দেয়। এই মূলনীতি যারা বিশ্বাস করবে এবং বুকে লালন করবে তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। আর যারা এই নীতির বাইরে চলে যাবে, তারা ফিরকাবাজিতে লিপ্ত হবে।

সুন্নাতের মূল স্তম্ভ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ। ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَكُمْ

"আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য তিনটি কাজে সন্তুষ্টি-প্রকাশ করেছেন—তাঁর ইবাদত করবে, তার সাথে কোনো কিছুকেই শরীক

[৬] সূরা আল ইমরান, ৩ : ১০৩
[৭] সূরা আল ইমরান, ৩ : ১০৫

> করবে না এবং আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর যাদেরকে কর্তৃত্বশীল বানিয়েছেন, তাদের কল্যাণ কামনা করবে।"

যায়েদ ইবনে সাবিত ও ইবনে মাসউদ[৮] ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ مُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ لُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مَنْ وَرَائَهُمْ

> "আল্লাহ ওই ব্যক্তি (-র মুখ) কে উজ্জ্বল করুন—যে আমার কথা শুনে সংরক্ষণ করে এবং অপরের নিকট তা পৌঁছে দেয়! কারণ অনেক ব্যক্তি গভীর জ্ঞানের কথা বহন করে চলে, কিন্তু নিজেরা ধীশক্তির অধিকারী নয়; আবার অনেক লোক ধীশক্তির অধিকারী বটে, তবে (প্রচারের মাধ্যমে) তারা সেই জ্ঞানকে এমন লোকের কাছে পৌঁছে দেয় যারা অধিকতর ধীশক্তির অধিকারী। তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলিমের অন্তরে কখনও বিতৃষ্ণা জাগে না—(১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা; (২) শাসকদের উপদেশ দেওয়া ও (৩) সংঘবদ্ধ জীবনকে আঁকড়ে ধরা। শাসকদের উপদেশ দিলে তাদের পেছনে যারা আছে তারাও উপদেশের আওতায় চলে আসে।"[৯]

এই গুণগুলোর প্রতি কোনো মুসলিম উদাসীন থাকতে পারে না। বরং মুসলিমরা মনে-প্রাণে এই তিন গুণকে নিজের ভেতরে লালন করে।

এই মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত প্রথম আলোচনাটি আমাকে দিয়ে শুরু করব।

আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হোন, আপনারা জানেন—আমি কোনোভাবেই চাই না যে, আমাদের সঙ্গীসাথিদের থেকে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোনো বিষয়ে একজন সাধারণ মুসলিমকেও কষ্ট দেওয়া হোক। আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোনো অভিযোগ বা তিরস্কার নেই বরং আগের চেয়ে

[৮] দুজনই ছিলেন ফকীহ সাহাবি।

[৯] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৩৬৬০; সহীহ।

তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা, হৃদ্যতা এবং সম্মান বহুগুণে বেড়েছে। তাদের হিসাব-নিকাশ তারাই দিবে।

মানুষের তিনটা স্তর রয়েছে, হয়তো সে মুজতাহিদ হয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছয় অথবা ভুল করে বা গুনাহে লিপ্ত হয়। যদি সে ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছয় তা হলে পুণ্য ও প্রতিদান পাবে এবং শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অধিকারী হবে। আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে তা হলে এর জন্য প্রতিদান পাবে এবং ভুলের জন্য মার্জনা পেয়ে যাবে। আর যদি ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল করে, তা হলে আমি দুআ করি আল্লাহ তাআলা আমাকে ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

পরিশেষে আমি কথার ইতি টানব এই আলোচনা দিয়ে,

আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, অমুক দায়িত্বহীন কাজ করছে, সে এই আমলটা করছে না, ওই লোকের কারণে শায়েখের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে, তমুকে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী, ওমুকে ওমুকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে কানভাঙিয়েছে, ওমুক (শায়েখের) বিরুদ্ধে (আমীরকে) কানপড়া দিয়েছে এবং এ ধরনের আরও অনেক কথাবার্তা; যার মাধ্যমে অন্যান্য ভাইদের প্রতি কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। এভাবে (কোনো মুসলিম ভাইকে) কষ্ট দেওয়া হলে, আমি কখনোই তা ক্ষমা করব না।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বরং (সত্যিকার অর্থে আমার বিরুদ্ধে) যারা এমন কাজে জড়িয়েছে, তারা তিরস্কারের যোগ্য। তবে তারা যতটুকু ভালো আচরণ করেছে, আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। কেউ যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এবং তার অতীতের গোনাহও মাফ করে দেবেন।

আপনারা আরও জানেন, আমার বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি বর্তমানে কী পরিমাণে কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে এবং নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। অতীতে দামেশকে হয়েছে আর এখন মিশরে হচ্ছে। মজলুমদের জন্য এগুলো কোনোভাবেই অকল্যাণকর নয়। আর এসবের কারণে আমাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এবং কারও প্রতি বিদ্বেষও তৈরি হয়নি। বরং নিপীড়ন আর নির্যাতন সহ্য করার পর ভাইদের মর্যাদা এখন আরও বেড়ে গিয়েছে, সুখ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা আরও বেশি প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছে।

এগুলো বস্তুত মুমিনদের জন্য কল্যাণের আভাস। এসবের মাধ্যমে তিনি মুমিনদের একদলকে অন্য দলের মাধ্যমে সংশোধন করেন। কেননা এক মুমিনের সাথে অপর মুমিনের (সম্পর্কের) দৃষ্টান্ত এমন—যেভাবে এক হাত অপর হাতকে ধুয়ে দেয়। আর এই দমন-নিপীড়নও আমাদের প্রশংসার একটি কারণ।

আপনারা জানেন, তাকওয়া ও কল্যাণকর কাজে আমরা একে অপরের সহযোগী। কেননা (নেককাজে) আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করতে বাধ্য, এটা অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এখন আরও বেশি জরুরি। তাই কেউ যদি কোনো ভাই-বন্ধুদেরকে কষ্ট দিয়ে ব্যথিত করার পরিকল্পনা আঁটে এই জন্য যে, দামেশক অথবা মিশরে এই ধরণের কষ্ট ও নিপীড়ন সেও তার কাছ থেকে পেয়েছে—তা হলে সে নির্ঘাত ভুল করবে। এমনকি কেউ যদি মনে করে মুমিনগণ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, তবে নিঃসন্দেহে তার এই ধারণাটি ভুল।

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"হকের বেলায় ধারণা-কল্পনা কোনোই কাজে আসে না।"[১০]

যদি কোনো বন্ধু আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এক ঘণ্টা বা তার কম সময়ে মধ্যে ফিরে আসে, তা হলে আমাদের কাছে তার মর্যাদা আগের চেয়ে আরও বেড়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আর আপনারা ভালো করে জানেন—বর্তমানের সংকটকে ইস্যু করে যে-সকল সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি এগুলোর মূল কারণ কিন্তু ইজতিহাদ-ভিত্তিক মতবিরোধ এবং কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা। কিন্তু এসবকে পুঁজি করে শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয় এবং শত্রুতা জাগিয়ে তোলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয়

[১০] সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৬

জালিম, দারুণ অজ্ঞ।"[১১]

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১২]

এ বিষয়ে আমার একটি উপলব্ধি বলতে চাই যেন ছোট বিষয় দিয়ে বড় বিষয় এবং দূরের বিষয় দিয়ে কাছের বিষয়ের প্রতি সতর্ক করা যায়।

আপনারা জানেন, বর্তমানের সংকটকে পুঁজি করে অসংখ্য মিথ্যা-বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এত বেশি গুজব ছড়িয়েছে, যা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব না। তবে মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তা যতই ছড়ানো হোক না কেন, পরিশেষে এগুলো আমাদের জন্য নেয়ামতই বয়ে আনবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা এই অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কোরো না। বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের পাপ কাজের ফল। এবং তাদের মধ্যে যে কিনা এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।"[১৩]

আল্লাহ তাআলা সত্যের আলো প্রকাশ করেছেন, এর মাধ্যমে মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা ও অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং যারা মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে আমার প্রতি অবিচার ও সীমালঙ্ঘন করেছে, আমি তাদের কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই না! তাদেরকে কিছু বলতেও

[১১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭২

[১২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭৩

[১৩] সূরা নূর, ২৪ : ১১-১৩

চাই না। আমি প্রত্যেক মুসলিমকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করি এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করি, অপর মুসলিমের জন্য তা-ই পছন্দ করি।

যারা আমার নামে মিথ্যা ছড়িয়েছে এবং আমার প্রতি অবিচার করেছে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তবে যে-সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার হক—এ ব্যাপারে তারা যদি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করে, তা হলে তিনি তাদেরকে মাফ করবেন। নয়তো আল্লাহর হুকুম তাদের ব্যাপারে বাস্তবায়িত হবে। অসৎকাজের পরেও যদি কোনো ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ থাকত, তা হলে (আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ক্ষেত্রে) যারা কোনো-না-কোনো ভূমিকা রেখেছে আমি তাদের প্রত্যেকের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করতাম। কেননা এই জন্য আমার প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই তার নিয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে কৃতজ্ঞতা-প্রাপ্তির একমাত্র উপযুক্ত। আল্লাহ মুমিনদের জন্য যে ফয়সালাই করেন, তা তাদের জন্য কল্যাণকর।

সদিচ্ছাপোষণকারীরা তাদের সদিচ্ছার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর নেক আমলকারীরা তাদের সদিচ্ছার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর অসৎকর্মশীলদের ব্যাপারে আমরা দুআ করি—আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন।

আপনারা ভালো করেই জানেন, (মাফ করে দেওয়াটাই) আমার স্বভাব। আমার এ মনোভাব অতীতের চেয়ে আরও দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু মানুষের হক মানুষের সাথে সম্পর্কিত, আর আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে তারা তাঁর বিচারের মুখোমুখি হবে।

আপনারা জানেন, ইফকের ঘটনায় আবু বকর ﵁ কসম করেছিলেন, তিনি মিসতাহ ইবনে আসাসাহকে কোনো প্রকারের সহযোগিতা করবেন না। কারণ সে ওই ঘটনায় জড়িত ছিল।

এরপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ

لَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন ক্ষমা করে এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এটা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৪]

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরপর আবু বকর ﵁ বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমি এটা পছন্দ করি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করুন।"

এরপর তিনি মিসতাহকে আগের মতো সাহায্য করতে থাকেন। (এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে,) মানুষকে ক্ষমা করা, অনুগ্রহ করা এবং এ জাতীয় আরও যে-সকল নেককাজ রয়েছে সেগুলো বেশি বেশি করা অপরিহার্য। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে কিতাব ও হিকমার মাধ্যমে যে আদেশ দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে জিহাদ করা (আমাদের জন্য) অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি হবে বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য-দানকারী, মহাজ্ঞানী।"[১৫]

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

[১৪] সূরা নূর, ২৪ : ২২

[১৫] সূরা মায়েদা, ০৫ : ৫৪

وَهُمْ رَاكِعُونَ

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ—যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।"[১৬]

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"আর যারা আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।"[১৭]

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

---

[১৬] সূরা মায়েদা, ০৫ : ৫৫

[১৭] সূরা মায়েদা, ০৫ : ৫৬

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার ভাই শরফুদ্দীন আবদুল্লাহ মিশর থেকে এই পত্রটি লেখেন তার সৎভাই বদরুদ্দীনের কাছে, যিনি দামেশকে অবস্থান করছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা তখন বন্দি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার কারাগারে। এটি ছিল ইমামের দ্বিতীয় কারাবাস। এই পত্রে ইমামের বিভিন্ন অবস্থা বিবৃত হয়েছে।

রিসালাহ-৩

শরফুদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে বদরুদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যার প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শরফুদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে প্রিয় ভাই বদরুদ্দীন ইবনে তাইমিয়্যার প্রতি...

আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত দয়া, রহমত ও বরকত নাযিল হোক মহান আলেমে দ্বীন শায়েখ বদরুদ্দীনের ওপর। তাকে নেয়ামত ও প্রাচুর্য দান করার মালিক একমাত্র তিনি। তিনি এই নেয়ামতের দ্বারকে তার প্রতি খুলে দিন, তার প্রতি কল্যাণের শ্রোতধারা প্রবাহিত করুন এবং এই নগরীতেই আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে আমাদের পুনরায় সাক্ষাতের তৌফিক দিন। পরিশেষে তাকে জান্নাতে ওই সকল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত করুন—যাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন।

আর তাকে চিরস্থায়ী আবাসে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীল ও তার নৈকট্যপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে একত্র করেন, যাদেরকে তিনি অপরিসীম নেয়ামত দান করেছেন।

পরসমাচার এই যে, প্রথমে আমি আপনাদের সামনে মহান আ[illegible] করছি যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। একমাত্র তিনি সকল প্রশংসার [illegible] এবং তিনিই সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সালাত ও সালাম প্রেরণ করছি সর্বশ্রেষ্ঠ আদম-সন্তান ও আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

আমরা আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নিয়ামতে ডুবে আছি এবং তার সীমাহীন অনুগ্রহে প্রতিনিয়ত সিক্ত হচ্ছি। আমাদের সম্মানিত ভাই (ইবনে তাইমিয়্যা) আলেকজান্দ্রিয়ার একটি দুর্গে বন্দি আছেন। আল্লাহর শত্রুরা তাকে নিয়ে বিভিন্ন চক্রান্ত করেছিল। এর মধ্য দিয়ে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা ভেবেছিল তাদের (খারাপ) উদ্দেশ্য সফল হবে, কিন্তু তাদের এই অসৎ পরিকল্পনাগুলো নস্যাৎ হয়েছে এবং পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

দুর্গবাসীরা সকলেই প্রিয় ভাইয়ের (ইবনে তাইমিয়্যার) সাথে সাক্ষাতে আসেন এবং ভাই (তাদের সামনে) কুরআন-সুন্নাহর আলোচনা করেন এবং কুরআন-সুন্নাহর শত্রু বিদআতিদের পরিণাম ও তাদের জিল্লতির বিবরণ তুলে ধরেন। ঘটনাক্রমে একটি ভ্রান্ত ফিরকার কিছু লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের বিভ্রান্তির স্বরূপ উন্মোচন করেন। পরিশেষে তাদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক তাওবা করে। ঘটনাটি আমির-কাজি-ফকীহ-মুফতি-শায়েখ-মাশায়েখ-সহ সাধারণ মুসলিম এবং মুজাহিদদের নিকট ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দুশমনদের ওপর আল্লাহর কালিমা বিজয় লাভ করে।

অতএব আমরা মহিমান্বিত রবের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন। তাদের (বিদআতিদের) মূলোৎপাটন করেন এবং তাঁর শরীয়ত, কিতাব ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন। আমরা মহান রবের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন সর্বদা আপনাকে তার সন্তুষ্টিমূলক আমল করার এবং কল ক্ষেত্রে উত্তম সিদ্ধান্ত নেওয়ার তৌফিক দান করেন।

আল্লাহ তাআলার শান্তি, দয়া, বরকত আপনার প্রতি এবং আপনার ভাগ্যমতী মমতাময়ী মহিয়সী আম্মাজানের প্রতি—যাকে আল্লাহ তাআলা এই বৃদ্ধকালে এবং জীবনসায়াহ্নে এনে সম্মান দান করেছেন—রব্বে কারীম তার ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখুন, তার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক পরিবারের সকলের ওপর; ভাই-বোন ও শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু-বান্ধব, কল্যাণকামী ও প্রতিবেশীদের ওপর।

পত্রটি লেখার সময় হৃদয়টা মুসলিমদের বিষয়গুলো নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিল।

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। রব্বে কারীম সালাত ও সালাম নাযিল করুন মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও তাঁর সাথিদের ওপর।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা প্রথমবার কারাবাসের সময় মিসর থেকে তার মায়ের কাছে এই পত্র লেখেন। পত্রে তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মায়ের সান্নিধ্য পাবার আকুলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন, মায়ের সান্নিধ্য তার অতি প্রিয়। কিন্তু দ্বীনি কারণে বাধ্য হয়েই মা-কে ছেড়ে সুদূর মিসরে অবস্থান করতে হচ্ছে তাকে।

রিসালাহ-৪

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে বন্ধু-বান্ধব ও সুহৃদদের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"আর তোমার রবের অনুগ্রহের কথা তুমি বর্ণনা করো!"[১৮]

আল্লাহ তাআলা আহলুস সুন্নাহর ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে ইহসান করেছেন এবং তাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই! আমি এত বেশি নিয়ামতের মধ্যে আছি, যা আমার সারাজীবনেও দেখিনি। আল্লাহ তাআলা আমার ওপর আপন অনুগ্রহ, দয়া, নিয়ামতের দরজা এমনভাবে খুলে দিয়েছেন, যা কখনও কল্পনাতেও আসেনি।

আহলুস সুন্নাহকে তারাই চিনতে পারে যাদের রুচিতে আল্লাহর (পরিচয়) জাগ্রত আছে, তাওহীদের (জ্ঞান) এবং ঈমানের হাকীকত। আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ক্ষেত্রে এ রকম ঈমান, ইলম (আল্লাহর পরিচয় ও তাওহীদ) কাম্য।

নিশ্চয় আল্লাহর পরিচয়, তাওহীদের জ্ঞান, ঈমানের হাকীকত এবং কুরআনের সঠিক পরিচয় জানার মধ্যেই জীবনের স্বাদ, আনন্দ, প্রফুল্লতা ও প্রাচুর্য নিহিত রয়েছে—যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

অনেক শায়েখরা বলেন, "আমি এমন অবস্থার মধ্যে রয়েছি, যার সম্পর্কে আমি এটুকু বলতে পারি যে, জান্নাতীরা যদি এ অবস্থার মধ্যে থাকত তা হলে তারা উত্তম অবস্থার মধ্যেই থাকত।"

[১৮] সূরা আদ-দুহা, ৯৩ : ১১

আরেকজন শায়েখ বলেন, "অন্তরে (ঈমান থাকার কারণে) এমন অনেক সময় অতিবাহিত হয়, যখন তা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। ঈমান আর আল্লাহর পরিচয়ের নিয়ামত ব্যতীত দুনিয়াতে আর এমন কোনো নিয়ামত নেই, যা আখিরাতের নিয়ামতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।"

তাই নবী ﷺ বলতেন,

يَا بِلَالُ، أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ

"বিলাল! সালাতের মাধ্যমে আমাদের (অন্তরকে) প্রশান্ত করো।"[১৯]

নবী ﷺ (কখনও) বলতেন না সালাত থেকে আমাদেরকে রেহাই দাও—যা ওই সকল লোকেরা বলে থাকে, যাদের কাছে সালাত খুবই কঠিন মনে হয়! যেমনটি আল্লাহ তাআলা এইভাবে বর্ণনা করেছেন,

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

"সালাত খুবই কঠিন, তবে যারা বিনয়াবনত (তাদের জন্য নয়)!"[২০]

সালাতে 'খুশু' অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলার জন্য অন্তর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বিনয়ী, স্থির এবং প্রশান্ত হওয়া।

নবী ﷺ বলতেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"দুনিয়াবি বিষয়ের মধ্যে নারী এবং সুগন্ধিকে আমার প্রিয় করা হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, আমার চোখের শীতলতা নিহিত আছে সালাতের মধ্যে।"[২১]

সালাতের মধ্যে মানুষের অন্তর ওয়াসওয়াসার শিকার হয় এবং শয়তান প্রবৃত্তি ও সংশয়গুলোকে জাগিয়ে তোলে, যা হৃদয়ের সুখকে মাটি করে দেয়। যে ব্যক্তি (আল্লাহর ভালোবাসার মতো কোনো) গাইরুল্লাহকে ভালোবাসবে, সে

---

[১৯] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ২৩০৮৮

[২০] সূরা বাকারা, ০২ : ৪৫

[২১] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১৪০৩৭; হাসান। দুনিয়ার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রিয় জিনিস হলো দুটি—স্ত্রী এবং সুগন্ধী। চক্ষুর শীতলতা আসবে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে। আর কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো সালাতে নিমগ্ন হয়ে রব্বে কারীমের সাথে একান্ত হওয়া।

দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবের সম্মুখীন হবে।

যদি সে কাঙ্ক্ষিত (গাইরুল্লাহকে) পেয়েও যায় তা হলে এই প্রাপ্তি তার জন্য আযাবের কারণ হবে। আর যদি সে তা না পায় তা হলে আফসোস ও পেরেশানির শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লাহর ভালোবাসা এবং তিনি যা পছন্দ করেন, তা গ্রহণ করা ব্যতীত অন্তর কখনও প্রফুল্ল ও তৃপ্ত হতে পারে না।

আল্লাহ ব্যতীত সকল প্রিয় বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দৃঢ় হয়। আর এটাই হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মর্মকথা এবং আল্লাহ তাআলার বন্ধু ইবরাহীম ﵇-সহ সকল নবী-রাসূলের আদর্শ।

নবী ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, তোমরা বলো,

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমরা ইসলামের ফিতরাত, তাওহীদের কালিমা এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন আর আমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর সকাল অতিবাহিত করলাম, যিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ ও আত্মসমর্পণকারী বান্দা; তিনি মুশরিক ছিলেন না।"[২২]

নবী ﷺ যে-সকল বিষয় আদেশ ও নিষেধ করেছেন, তা মেনে চলার মধ্যেই সকল কল্যাণ। অথচ নবীজি যা নিয়ে এসেছেন, তার হাকীকত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। আর মানুষের কাছে যা রয়েছে, তা একটি খণ্ডিত (দ্বীন)। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

"যারা সৎপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে তাকওয়াবান হবার তৌফিক দান

[২২] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১৫৩৬০; সহীহ।

করেন।"[২৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় জালিম, দারুণ অজ্ঞ।"[২৪]

নিশ্চয়ই আল্লাহর মুত্তাকি ওলিগণ, তাঁর পথে সফলতা অর্জনকারীগণ এবং বিজয়ী সৈনিকদের মূল উদ্দেশ্য হলো তাওবা (অনুশোচনামূলক প্রত্যাবর্তন)। আর এ জন্যই তাওহীদ এবং ইস্তিগফার হলো এই দ্বীনের সামগ্রিক কাঠামো।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ

"তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাকো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করো।"[২৫]

তাওহীদের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মর্মকথা হলো আল্লাহর সকল আদেশ বাস্তবায়ন করা আর নিষেধগুলো পরিহার করা ।

আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে তাওহীদের নেয়ামত দান করলে সে হৃদয়ের গভীর থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য প্রদান করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপত্তা, সুখ, প্রফুল্লতা ও সৃষ্টিজীবের প্রতি মমতাবোধের গুণে গুণান্বিত করেন।

আর শিরকের কারণে মানুষের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

---

[২৩] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৭

[২৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭২

[২৫] সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম সিজদা, ৪১ : ৬

আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

"খুব শীঘ্রই আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করব। কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, যে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো জাহান্নামের আগুন। বস্তুত জালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"[২৬]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ

"দীনার, দিরহাম ও মূল্যবান চাদরের গোলামেরা ধ্বংস হোক। আল্লাহ এদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের কাঁটার খোঁচা খেয়েও সে বের হতে পারবে না।"[২৭]

ইবরাহীম ﷺ মুশরিকদেরকে উপাসনা ও শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছিলেন,

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদেরকে কীভাবে ভয় করি? যেখানে তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করতে ভয় করো না, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, কোন দল নিরাপত্তা পাওয়ার বেশি হকদার, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাকো (তা হলে বলো?)।"[২৮]

তাই তো ইমাম আহমাদ ﷺ কিছু মানুষকে বলেন, "যদি তুমি সঠিক কথা বলতে, তা হলে কাউকেই ভয় পেতে না।"

---

[২৬] সূরা আল ইমরান, ০৩ : ১৫১

[২৭] ইবনে মাজাহ, আস-সুনান : ৪১৩৬; সহীহ।

[২৮] সূরা আনআম, ০৬ : ৮১

আর যারা নবীজির সকল আদেশ মেনে চলবে, তারাও এই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّـهَ مَعَنَا

"তুমি পেরেশান হোয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।"[২৯]

এবং তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহকে সাহায্যকারী হিসেবে পাবে, এই বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর এ বিষয়ে আমাদের যে-সকল অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা বর্ণনা করতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর আনীত (দ্বীন)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে, সে আল্লাহ তাআলার এই আয়াতাংশের উপযুক্ত হবে,

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ

"তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীই তো নির্বংশ।"[৩০]

আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ বলেন, "সব সময় আহলুস সুন্নাহর একটি জামাআত অবশিষ্ট থাকবে এবং তাদের আলোচনাও টিকে থাকবে। আর বিদআতীরা মরে যাবে সাথে তাদের নামনিশানাও মিটে যাবে। বিদআতীরা নবীজির আনীত দ্বীনকে অবমাননা করেছে, তাই তারাও লাঞ্চিত হবে।"

আর যারা নবী ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে সমুন্নত করেছে তারা এই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি।"[৩১]

এ বিষয়টি সুনিশ্চিত, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে (তার মনোবাসনা পূরণের জন্য) ডাকবে, সে মুশরিক। কেননা মানুষ যখন কোনো সৃষ্টিজীবের কাছে অভিযোগ দায়ের করে, তখন তাদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হয়। বিষয়টি অনেক বিস্তৃত। এ নিয়ে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আর বিষয়টা আমি যেমন তাত্ত্বিকভাবে জানি, তেমনই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও প্রমাণ পেয়েছি।

---

[২৯] সূরা তাওবা, ০৯ : ৪০
[৩০] সূরা কাউসার, ১০৮ : ৩
[৩১] সূরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৪

পরিশেষে এটাই বলব, আমি এ অবস্থান থেকে আল্লাহ তাআলার যে নেয়ামত লাভ করছি, তা বড়ই মূল্যবান এবং সংখ্যায় এত বেশি যা গুণে শেষ করার মতো না। কিন্তু আমার (দ্বীনি) ভাইয়েরাই আমার বেশি ক্ষতি করেছে। তবুও আমি চাই—তারা সুখ-শান্তি আর নেয়ামত-প্রাচুর্যে অবস্থান করুক, যা তাদের চক্ষুকে শীতল করবে। তাদের সামনে আল্লাহ তাআলার মারিফাত প্রকাশিত হোক, তাঁর আনুগত্য নসীব হোক এবং তাঁরই পথে জিহাদের সুযোগ হোক। যার মাধ্যমে তারা সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত হতে পারবে।

এই সকল কথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, বন্ধু-বান্ধব ও কল্যাণকামীদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছনো যে, আমার ওপর বর্তমানে যেসব নিয়ামত দান করা হচ্ছে তা আগের চেয়েও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আল্লাহ তাআলার অপরিসীম নেয়ামতে অবস্থান করছি। যদিও বিভিন্ন কারণে বন্ধু-বান্ধব আর শুভানুধ্যায়ীদের সাথে সাক্ষাতে আসতে পারছি না। কিন্তু আমি দিবানিশি তাদের জন্য দুআ করছি, সাথে সাথে তাদের কিছু হকও আদায়ের চেষ্টা করছি। এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর নৈকট্য কামনা করি। আমি আমার সাথিদের প্রতি এই আদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন, নেক আমল করুন, তাঁর নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করুন। আর একে অপরের জন্য এই পরিমাণ দুআ করুন, যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ দুআ করতে আদেশ দিয়েছেন।

হে আল্লাহ! আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী এবং মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের ক্ষমা করুন। তাদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি কায়েম করে দিন! তাদের অনৈক্য ও বৈরিতাগুলো দূর করে দিন! তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের ওপর সাহায্য করুন! প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল পাপাচার ও গর্হিত কাজ থেকে তাদেরকে হেফাজত করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীন, কিতাব এবং আপনার বান্দাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফির আর ওই সকল মুনাফিকদের শাস্তি দিন, যারা আপনার পথ থেকে মানুষদের বিরত রাখে এবং আপনার শরীয়তকে পরিবর্তন করে। হে আল্লাহ! আপনি অপরাধীদের শাস্তি প্রেরণ করুন, যা থেকে তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। হে আল্লাহ! আপনি মেঘমালা পরিচালনকারী! আপনিই কিতাব অবতীর্ণকারী! এবং আপনি সৈন্যবাহিনীগুলোকে পরাজিতকারী! আপনি তাদেরকে পরাজিত করুন, তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

রব আমার! আমাদের পক্ষে সাহায্য করুন, বিপক্ষে সাহায্য করবেন না। আমাদের জয়ী করুন, আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে জয়ী করবেন না। আমাদের অনুকূলে কৌশল করুন, প্রতিকূলে কৌশল করবেন না। আমাদের ওপর সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, অনুগত ও বিনয়ী বানিয়ে দিন! রব আমার! আমাদের তাওবা কবুল করুন, আমাদের পাপরাশি দূর করে দিন। আমাদের দলিলগুলো প্রতিষ্ঠিত করে দিন, আমাদের কথাকে সঠিক রাখুন আর আমাদের অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত রাখুন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সুন্নতকে বিজয় দান করেছেন এবং বিদআতীদের অপদস্থ করেছেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথিদের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা এই পত্রটি লিখেছিলেন কায়রো থেকে। সুলতান মুহাম্মাদ বিন কালাউনের নির্দেশে ইমামকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইমাম কায়রোতে এসে হুসাইন মসজিদের পাশে বসবাস করতে থাকেন। এসময় তিনি নিজেকে শিক্ষাদানে ব্যস্ত রাখতেন। তার পরিবারের কাছে কিছু বইপত্র চেয়ে ইমাম এই পত্র লিখেছিলেন।

রিসালাহ-৫

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে তার পরিবারের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আপনারা জানেন, আমি (এখন) আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ভোগ করছি, যা অধিকাংশ মানুষ কল্পনাও করে না এবং তাদের ধারণাতেও আসে না। পবিত্র ও বরকতময় সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য—যেমনটা তিনি পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন।

হক সব সময় জয়ী হয়, সমুন্নত থাকে এবং (ক্রমান্বয়ে) বৃদ্ধি পায় আর বাতিল পরাজিত হয়, পতন ও ধ্বংসের পথে এগোয়। আল্লাহ তাআলা বিরোধী-পক্ষকে দুর্বল করে দিয়েছেন। আর তাদের নেতারা এখন সন্ধি ও আপস চাচ্ছেন, যার তালিকা অতি দীর্ঘ। আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাদেরকে বেশ-কিছু শর্ত দিয়েছি যেখানে ইসলাম ও সুন্নাহকে শক্তিশালী আর বিদআতকে বর্জনের প্রস্তাব রয়েছে; তারা এতে সম্মত হয়েছে। আর এগুলো কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা তাদের মৌখিক কথায় আশ্বস্ত হইনি, তাদের দেওয়া শর্তও মেনে নিইনি। আমাদের দেওয়া শর্তগুলো তারা কার্যকর করলেই এ বিষয়ে আলোচনা এগোবে। আমাদের অবস্থানের কারণে ইসলাম ও সুন্নাহর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, আর তারা যদি আমাদের এ শর্তগুলো মেনে নেয় তা হলে সেটা হবে তাদের পুণ্যকাজ যা তাদের পাপসমূহকে মিটিয়ে দিবে।

ইতিমধ্যে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যা ইসলামের বিজয় ও কর্তৃত্বের জানান দিচ্ছে। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের প্রতি সুবিশাল নেয়ামত, যার বিবরণ দিতে গেলে (চিঠি অনেক) দীর্ঘ হয়ে যাবে।

পত্রটি পাঠালাম মূলত গির্জাসংক্রান্ত আমার লিখিত একটা সিরিজ পাঠানোর জন্য, যেটা আমার এখন প্রয়োজন। দেখবে, সেগুলো আমারই হস্তলিখিত বেশ-

কিছু পৃষ্ঠার সমষ্টি যার অর্ধেক দেশেই রেখে এসেছিলাম। ইন-শা-আল্লাহ এটা পাঠিয়ে দিয়ো। এর জন্য শায়েখ জামালুদ্দীন আল-মিজ্জীর সহযোগিতা নিতে পারো। কেননা তিনি এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, তাই সিরিজটা তিনিই বের করে দিতে পারবেন। এর সঙ্গে পারলে কাজি আবুল হুসাইনের হস্তলিখিত আবু ইয়ালার পর্যালোচনা-কপিগুলোও পাঠিয়ে দিয়ো। এটি এগারো খণ্ডের কিতাব। যদি সম্ভব হয় তা হলে সবগুলোই পাঠিয়ো। আর না হলে প্রথম তিন খণ্ড পাঠিয়ো।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা এই পত্র লিখেছিলেন নাসর মিনবাজির কাছে। নাসর মিনবাজি ছিলেন মিশরের একজন শীর্ষস্থানীয় সুফি। তিনি সুলতান রুকনুদ্দীনকে নানা কথা বলে ইবনে তাইমিয়্যার ব্যাপারে খ্যাপিয়ে তোলেন। শেষে সুলতান বাধ্য হয়ে শায়খকে আলেকজান্দ্রিয়ার কারাগারে বন্দি করে। শায়খ কারাগার থেকে মিনবাজিকে এই পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রে শায়খ তাকে অত্যন্ত সম্মান দিয়ে নম্রতার সাথে কথা বলেছেন। পত্রে তিনি বলেন, সুফীদের সকল কথাবার্তা এবং ভালোবাসা নিবেদন স্পষ্টভাবে হওয়া উচিত। ভালোবাসা কেবল আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল ﷺ ও আল্লাহর শরীয়তের প্রতি নিবেদন করা উচিত। দ্বীন ও শরীয়তকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা উচিত।

রিসালাহ-৬

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে নাসর মিনবাজির প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে আল্লাহর পথের পথিক ও সম্মানিত বুজুর্গ আবুল ফাতাহ আন-নাসর মিনবাজির প্রতি!

আল্লাহ তাআলা আপনার জাহেরি-বাতেনি ওই সকল বিষয় স্পষ্ট করে দিন, যা তিনি নিজের প্রিয় বান্দা ও আউলিয়াদের হৃদয়ে স্পষ্ট করেন। প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ তাআলা আপনাকে জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের ওপর বিজয় দান করুন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর তরীকা—যা দ্বীন ও শরীয়তের পূর্ণ অনুগামী—সেই তরীকায় আপনাকে পরিচালিত করুন এবং আপনার সামনে দ্বীনের হাকিকত স্পষ্ট করে দিন, যা সৃষ্টি ও আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে পার্থক্য রেখা টেনে দেবে।

পরসমাচার এই যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি দ্বীন ও দুনিয়ার প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয়ের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। যারা পৃথিবীতে দাম্ভিকতা দেখায় না ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না, ওই সকল মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহ আপনাকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন আর আল্লাহ-প্রেমী করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা আপনাকে মারিফাত ও সদিচ্ছার গুণে গুণান্বিত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও মারিফাত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তবে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার নামে এমন ভালোবাসার অবতারণা করেছেন, যাতে শিরক মিশ্রিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি হবে বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য-দানকারী, মহাজ্ঞানী।"[৩৬]

সুতরাং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহও যাদেরকে ভালোবাসবেন পূর্ণতার বিচারে তাদের মধ্যে ওইসব গুণের সমন্বয় থাকতে হবে যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের গুণাবলি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো কঠোরতা ও কোমলতার সমন্বয়। আর এ (গুণটিই) মুসলিম মিল্লাতের সাথে অন্যান্য জাতির পার্থক্য নির্দেশ করে, যা আল্লাহর দুশমনদের প্রতি কঠোর হওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুদের প্রতি কোমলতা ও দয়া-প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত।

অনেক (সুফিদের অন্তরে) আবেগ রয়েছে কিন্তু (আল্লাহর প্রতি) ভালোবাসার বিষয়টি তাদের কাছে অস্পষ্ট। আর এ ব্যাপারে তাদের বড় একজন ব্যক্তির কবিতাই দেখুন,

সে ঘর ছেড়ে বাস্তহারা হয়ে রয়েছে পড়ে

নিবাস থেকে রয়েছে দূরে,

দিবানিশি কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে,

প্রেমে উন্মাদ হয়েছে অথচ জানে না—কার প্রতি তা নিবেদন করছে।

শায়েখ, আল্লাহ আপনার প্রতি ইহসান করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এমন জ্ঞান দান করুন যা ঈমানি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং শিরক থেকে মুক্ত।

শরীয়তে ইবাদতের ক্ষেত্রে "আল্লাহর নাম" আর দুআর ক্ষেত্রে "রব" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে মুসল্লী ও যিকিরকারীরা "আল্লাহু আকবার", "সুবহানাল্লাহ", "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে থাকেন। আর দুআর ক্ষেত্রে (রব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে,যেমন)

---

[৩৬] সূরা আল-মায়িদা, ০৫ : ৫৪

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا

"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি।"[৩৭]

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

"হে আমাদের রব! আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে মার্জনা করুন।"[৩৮]

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"তারা কেবল বলেছে, হে আমাদের রব! আমাদের পাপ ও আমাদের কাজে যা-কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তা ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের দৃঢ় রাখো এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।"[৩৯]

বেশিরভাগ সুফি তাদের আধ্যাত্মিক পদযাত্রায় তাওহীদুর রুবুবিয়্যা (আল্লাহর প্রতিপালন) এবং সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর চিরন্তন নীতিগুলো দেখতে পায়। অতঃপর তারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাকেই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে এর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ফলে তাওহীদুল উলুহিয়্যার চেয়েও তাওহীদুর রুবুবিয়্যা নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট থাকে।

তাওহীদুল উলুহিয়্যা হলো—এক আল্লাহর ইবাদত করা যার কোনো শরীক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, আল্লাহ যা-কিছুর আদেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং তাঁর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা। আর যারা তাওহীদুল উলুহিয়্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যাকে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মুশরিক কাদেরিয়া ফিরকার মতো, যারা বলে বেড়ায়—"যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, তা হলে তো আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরক করতাম না।"

আর যারা তাওহীদুর রুবুবিয়্যা ছেড়ে শুধু তাওহীদুল উলুহিয়্যাকেই গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো অগ্নিপূজারি কাদেরিয়া ফিরকার মতো। তাদের দাবি হলো

[৩৭] সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : ২৩

[৩৮] সূরা নূহ, ৭১ : ২৭

[৩৯] সূরা আল ইমরান, ০৩ : ১৪৭

বান্দার কর্মগুলো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি (তারা মনে করে, কর্মের ক্ষেত্রে বান্দা স্বাধীন)। এবং সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাকে ছেড়ে যে-সকল ফেরকার লোকেরা শুধু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাকে নিয়ে মেতে থাকে তারা ইবাহিয়্যা ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে স্বাধীন মনে করে এবং সকল কাজকর্ম নিজেদের খেয়াল খুশিমতো করে। তাদের এই সব ধারণা নিতান্তই অমূলক। তাদের অধিকাংশই শরীয়ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রভুর আসনে বসেছে। তারা যে ধরনের ইবাদত ও দুনিয়া-বিমুখতা প্রদর্শন করে, তা শরীয়ত-সম্মত নয়। ফলে তারা কখনও কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আর তাদের দৃষ্টান্ত হলো সন্ন্যাসী ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মতো।

তাই তো শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (আল্লাহ তার আত্মাকে সম্মানিত করুন) বলেন, "অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর নিয়ে ভাবার পর থমকে যায়। আমার জন্য এই ক্ষেত্রে একটি ছোট্ট বাতায়ন খুলে যায়। আর আমি সত্য অর্জনের জন্য এক তাকদীর দিয়ে অন্য তাকদীরের সাথে বোঝাপড়া করি। ওলি তো সে-ই, যে তাকদীরের সাথে বোঝাপড়া করে। যে তাকদীরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে না, সে কখনও ওলি হতে পারে না।"

শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী যেটা বলেছেন, বাস্তবে তিনি নবী ﷺ-এর ভাষায় কথা বলেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তাআলা যে-সকল বিষয়ে আদেশ করেছেন, সেগুলো পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। সুতরাং (কোনো নিষিদ্ধ কাজ) যদি তাকদীরের পক্ষ থেকে চলে আসে তা হলে এই তাকদীরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অন্য আরেকটা তাকদীরের সাহায্যে মুসলিমরা প্রতিরোধ করবে। *তাবারানী*-তে এসেছে—দুআ এবং বালা-মুসিবত আসমান ও জমিনের মাঝে একে অপরের মুখোমুখি হয়।

তিরমিযী-র বর্ণনায় এসেছে—প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ওই সকল ওষুধ-পথ্যের ব্যাপারে কী বলেন, যেগুলো দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি? ওই সকল রুকইয়াহর ব্যাপারে কী বলেন, যেগুলো দিয়ে আমরা ঝাড়ফুঁক করি? এবং ওই সকল বিষয়ের ব্যাপারে কী বলেন, যেগুলো দিয়ে আমরা নিজেদের রক্ষা করি? এগুলো কি আল্লাহ তাআলার কোনো তাকদীরকে ফিরিয়ে দেয়?

তখন নবী ﷺ বললেন,

هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ

"এগুলো তো আল্লাহ তাআলার তাকদীরেরই একটি অংশ।"[৪০]

মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল জীব নেই যার দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। তিনিই সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশ্বজাহানের রব। আর বান্দাদের অন্তর ও লাগাম আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই, তিনি ছাড়া কোনো কল্যাণকারী নেই; কোনো ক্ষতিসাধনকারীও নেই; তিনি ছাড়া কোনো দাতা নেই, কোনো প্রতিরোধকারীও নেই; তিনি ছাড়া কোনো হেফাজতকারী নেই; কোনো ইজ্জত-দানকারী নেই; তিনি ছাড়া অপদস্থকারীও কেউ নেই।

আল্লাহর-নির্দেশিত বিষয় যত বেশিই হোক না কেন মুসলিমরা তা পালন করে এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় যত অধিকই হোক না কেন মুসলিমরা তা পরিত্যাগ করে। এটাই সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, যেখানে সকল নবী-রাসূলগণ শামিল। এটাই সার্বিক ইসলাম ও ঈমান। এ সকল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই মাক্কী সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

"তিনি তোমাদের জন্য সে দ্বীনই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কোরো না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে বড় কঠিন বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ-প্রদর্শন করেন।"[৪১]

[৪০] তিরমিযী, আস-সুনান : ২০৬৫; হাসান সহীহ।
[৪১] সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ১৩

এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি (যেন তারা লোকদেরকে আহ্বান করে যে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।"[৪২]

এ কারণেই ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ باب ما جاء ان دين الانبياء واحد (সকল নবীদের দ্বীন একই)–এই শিরোনামে একটি অধ্যায় লিখেছেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"ঈমানদার ইহুদী ও খ্রিষ্টান, সাবিঈ—যারাই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও আমলে সালিহ করেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান এবং তাদের জন্য কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।"[৪৩]

চারটি ধর্মেই এই একটি বক্তব্য সার্বজনীন যে, আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান আনা, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং সৎকর্ম করা।

আয়াতের শুরুতে বিশেষভাবে মুমিনদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারন তারা শরীয়ত-সম্মত ঈমান লালন করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি বিধান ও পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।"[৪৪]

অতএব উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য একমাত্র পথ হলো ইসলামি শরীয়ত ও পদ্ধতি।

[৪২] সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৩৬
[৪৩] সূরা আল-বাকারা, ০২ : ৬২
[৪৪] সূরা মায়েদা, ০৫ : ৪৮

আল্লাহ তাআলা বলেন,

خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"(তোমরা) শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে সমগ্র মানব-জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।"[৪৫]

এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই মাদানী সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। আর মদীনাতেই শরীয়ত ও সুন্নত বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম, উত্তরাধিকার আইন ও দণ্ডবিধি নাযিল করা হয়েছিল।

আমি জানতে পারলাম, কিছু লোক আপনাদের নিকট ইত্তিহাদিয়্যা ফিরকার সমালোচনার বিষয়টা উত্থাপন করেছে! আমি আপনাদের নিকট প্রয়োজনের কারণে একটি পত্র লিখেছিলাম। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্রটিতে কিছু লোকের অবস্থা নিয়ে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমার পত্রের মৌলিক বিষয় এটা ছিল না।

কিন্তু শায়েখ! আপনি মুমিনদের ভরসার পাত্র, ফলে আমাদের দায়িত্ব হলো আপনাকে দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ে সহযোগিতা করা, আপনি যা পাওয়ার যোগ্য।

(ইত্তিহাদিয়্যা ফিরকা) এই ব্যাপারে আমি একটি পত্র লিখেছিলাম যার কিয়দংশ আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। এমনকি এ বিষয়ে শায়েখ ইমাদুদ্দীন একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় জানেন—জ্ঞানী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আমি আল্লাহমুখী বান্দাদেরকে এদের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করছি। তবে (সাধারণ) মুসলিমদের এসব বিষয় নিয়ে তেমন ঘাঁটাঘাঁটি করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি ইহসান করুন। শায়েখ! আপনি ভালো করেই জানেন : নববী দাওয়াত, গোটা সৃষ্টিজগৎ তৈরি, আসমানি কিতাবসমূহ পাঠানো ও নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো—দ্বীনকে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ইত্তিহাদিয়্যা গ্রুপের কারণে তাতারদের মতো একটি গ্রুপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছে, এবং এরা ইসলামি শরীয়তকে নিষ্প্রাণ করে দেওয়ার জন্য দায়ী। তাতাররাই হলো মিথ্যাবাদী একচোখা দাজ্জালের অগ্রগামী

[৪৫] সূরা আল ইমরান, ০৩ : ১১০

দল, যে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে। আর দুনিয়ার সকল শির্ক এদের মতাদর্শে পাওয়া যায়।

তারা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ মেনে নেয়নি বরং তারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অংশীদারত্ব স্থাপন করেছে। তারা তাদের রবের সমকক্ষ হিসেবে (কাউকে) দাঁড় করিয়েছে। একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে, তাদের মধ্যে একজন হিন্দুস্তান চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বক্তব্য হলো : ইসলামি দুনিয়া তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অথচ হিন্দের লোকেরা মুশরিক। দুনিয়ার সবকিছুরই পূজা করে তারা। এমনকি ঘাস, লতা-পাতা থেকে শুরু করে জন্তু-জানোয়ারের পর্যন্ত।

তারা যদি নবী-রাসূলগণের পথে চলত এবং তাদের আনীত-পন্থা অবলম্বন করত, তা হলে অবশ্যই হিদায়াতের রাস্তা পেয়ে যেত, একই সাথে তারা দৃঢ় বিশ্বাসের প্রশান্তি এবং চক্ষুর শীতলতা অর্জন করতে পারত।

আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আম-খাস সকল মুসলিমের অবস্থা সঠিক ও সংশোধন করে দেন।

শায়খ! আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আপনাকে কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে কবুল করেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানাবে, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে, আর তারাই হলো সফলকাম।"[৪৬]

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

[৪৬] সূরা আল ইমরান, ৩ : ১০৪

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা সাইপ্রাসের সম্রাট, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, যুবরাজ, প্রিস্টদের কাছে তাদের প্রশ্নের জবাবে এই পত্র লিখেছিলেন। তারা কিছু প্রশ্ন পাঠিয়ে তার উত্তর জানতে চেয়েছিল। ইবনে তাইমিয়্যা এই পত্রে বিভিন্ন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্পষ্ট করেন।

রিসালাহ-৭

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে সাইপ্রাসের সম্রাটের কাছে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে স্বীয় জাতির নেতা সারজাওয়াজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিশপ, প্রিন্স ও অন্যান্যদের প্রতি—যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

পরসমাচার এই যে, আমি আপনাদের কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। যিনি ইবরাহীম এবং ইমরানের পরিবারের ইলাহ। তার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তার নির্বাচিত ও প্রেরিত নবীগণের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করেন। বিশেষ করে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সে-সকল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নবীগণের প্রতি, যারা ছিলেন সৃষ্টি জগতের মধ্যে সুভাগ্যবান এবং জাতিসমূহের নেতা। আল্লাহ তাআলা তাঁদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তাই তাঁরা অনন্য। তাঁরা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

“তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি

মুশরিকদের যেদিকে আহ্বান করছ, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান তাঁর দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।"[৪৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

"স্মরণ করো, যখন আমি নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম-তনয় ঈসার কাছ থেকে। আমি তাদের থেকে থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিলাম—সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"[৪৮]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি সালাত ও সালাম বর্ষণ করেন খাতামুল মুরসালীনের ওপর। যেদিন নবীগণ তাদের রবের কাছে ফিরে যাবেন সেদিন তিনিই হবেন তাদের ভাষ্যকার। যেদিন তারা পরস্পর একত্র হবেন সেদিন তিনিই হবেন তাদের ইমাম। কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির জন্য তিনিই হবেন সুপারিশকারী। তিনি রহমতের নবী, তিনি যুদ্ধের নবী। তাঁর মধ্যে একত্র হয়েছে সকল নবীর উত্তম গুণাবলি। তার ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছিলেন আল্লাহর এক বান্দা—যাঁকে আল্লাহ ফুঁকে দিয়েছিলেন পবিত্র সতী নারী মারইয়ামের প্রতি, যাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। আর এই বান্দা হলেন ঈসা বিন মারইয়াম। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি সম্মানিত। তিনি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত। তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন সৌন্দর্য ও দয়ার গুণের দ্বারা। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বানী ইসরাঈলের কাছে, যেখানে মূসা ﷺ-কে পাঠানো হয়েছিল মহত্ব ও কঠোরতার গুণ দিয়ে। সর্বশেষ নবীকে পাঠানো হয়েছিল কাফিরদের প্রতি কঠোর ও মুমিনদের প্রতি কোমল করে। তাঁর নিয়ে-আসা শরীয়ার মধ্যে পূর্ববর্তী নবীদের আনীত শরীয়ার সকল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাদের প্রতিও, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করবে।

---

[৪৭] সূরা শুরা, ৪২ : ১৩

[৪৮] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭-৮

আল্লাহ তাঁর কুদরতের মাধ্যমে সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। এসবের মধ্যে তিনি নিজের প্রজ্ঞা ও রহমতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর আদেশ মেনে চলা, তাঁর ইবাদত করার জন্যই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এসবের মূল হলো তাঁর পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর ভালোবাসা অর্জন করা। আল্লাহ যাকে ভারসাম্যপূর্ণ পথের সন্ধান দেন তাকে তাঁর আসমাউল হুসনা ও সুউচ্চ গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর পরিচয়, রহমত ও ইলম দান করেন। তাকে দান করেন তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর স্মরণে ভীত হওয়ার গুণ। ফলে সে আল্লাহর ইবাদত করে ভালোবাসা ও ভয় নিয়ে। সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে আগ্রহ, ভয় ও ভালোবাসা নিয়ে, অন্য কারও জন্য নয়। সে তার আখিরাত ও দুনিয়াকে দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠ করে নেয়। বান্দা আল্লাহর দিকে ওইভাবে ঝুঁকে যায় যেভাবে ঈগল তার বাসায় ফিরে যায়। বান্দা আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয় ওইভাবে, যেভাবে শিশু তার মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। আল্লাহ হলেন সবকিছুর শুরু এবং সমাপ্তির রব। তিনি বিচার-দিবসের মালিক। তোমরা যা দেখো এবং যা তোমাদের কল্পনার বাইরে, তার সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনি আলিমুল গাইব। তিনি যখন যা ইচ্ছা বলেন হও, আর তা হয়ে যায়।

যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় থাকে অবিচল। তারা আল্লাহকে ভালোবাসার মতো কাউকে ভালোবাসে না। তারা তাদের রবের সাথে আর কাউকে শরিক করে না। তারা আল্লাহ ব্যতীত কোনো ফেরেশতা, কোনো নবী কিংবা কোনো বন্ধুকে নিজেদের অভিভাবক ও সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করে না। আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা সকলেই রহমানের বান্দা। তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন সঠিকভাবে। কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর সামনে উপস্থিত হবে একাকী অবস্থায়। আল্লাহ তাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ পথ প্রদর্শন করেছেন। সত্য-মিথ্যার মধ্যে বিরোধকালে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ভারসাম্যপূর্ণ পথে পরিচালিত করেন।

আদম ﷺ-এর পর থেকে নূহ ﷺ-এর আগ-পর্যন্ত মানুষ তাওহীদ ও ইখলাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাদের পিতা আবুল বাশার আদম ﷺ। এরপর তারা শিরক এবং মূর্তিপূজা শুরু করে। নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক বিদআত প্রবর্তন করে। অথচ আল্লাহ তার নির্দেশ দেননি। এর জন্য কোনো রাসূলও পাঠাননি। শয়তান তার নিকৃষ্ট চক্রান্তের দ্বারা এসবকে তাদের সামনে সজ্জিত করে তুলেছে। তাদের সামনে এনে দিয়েছে ভ্রান্ত-দর্শন। একদল মনে করে মূর্তিগুলো মূলত আসমানের বিভিন্ন স্তর, তারকা

ও ঊর্ধ্বজগতের আত্মার তেলেসমাতি। অনেক গোত্র আছে যারা তাদের নবী ও নেককারদের মূর্তি তৈরি করেছে। এমনকি অনেকে জিন এবং শয়তানদের প্রতিকৃতি তৈরি করেছে। এভাবে একেক দল একেক কারণে মূর্তিপূজা শুরু করে।

তাদের অধিকাংশই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসারী। তারা হিদায়াতের পথ থেকে চলে গেছে ভিন্ন পথে। তারপর আল্লাহ তাদের কাছে নবী নূহকে প্রেরণ করেন—যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকেন, যাঁর কোনো শরীক নাই। তিনি তাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর ইবাদত করতে নিষেধ করেন। যদিও তারা এসবের ইবাদত করত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য, এবং তারা এদেরকে নিজেদের পক্ষে সুপারিশকারী বিবেচনা করত। নূহ ﷺ তাদের মাঝে ৯৫০ বছর অবস্থান করেন। পরে আল্লাহ যখন তাকে জানিয়ে দিলেন—যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না—তখন তিনি তাদের জন্য বদদুআ করেন। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ডুবিয়ে দেন। এরপর পৃথিবীতে আবার মুশরিক ও ধর্মান্তরিত ব্যক্তি দ্বারা সয়লাভ হয়ে যায়। আর আল্লাহ (হিদায়াতের পথ-প্রদর্শনের জন্য) একের-পর-এক রাসূল প্রেরণ করতে থাকেন। ফেরাউন এবং নমরুদরা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের রাজত্ব লাভ করে। তখন আল্লাহ ভারসাম্যপূর্ণ পথ অনুসরণকারীদের ইমাম ও বিশুদ্ধ মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি মানুষদের শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তারকা এবং মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেছিলেন,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে আমার চেহারা নিবিষ্ট করছি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[৪৯]

তিনি আরও বলেন,

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي

[৪৯] সূরা আনআম, ০৬ : ৭৯

وَيَسْقِينِ ۝٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝٨٠ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝٨١ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

"ইবরাহীম বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, তোমরা যাদের পূজা করো, তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা? সকল সৃষ্টির রব ছাড়া অবশ্যই তারা আমার শত্রু। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পান করান। আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। আর যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন তারপর আমাকে জীবিত করবেন। আর আশা করি, তিনি বিচার-দিবসে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।"[৫০]

ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারা তাদের কওমকে বললেন,

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٤

"তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।' কিন্তু তার পিতার উদ্দেশ্যে ইবরাহীমের উক্তিটি ছিল ব্যতিক্রম। সে বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করব, যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোনো অধিকার রাখি না। হে আমাদের রব! আমরা তোমার ওপরই ভরসা করি, তোমারই অভিমুখী হই এবং তোমার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন।"[৫১]

এরপর আল্লাহ ইবরাহীমের পরিবার থেকে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁদের প্রত্যেককে অনেক গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। মর্যাদার দিক

[৫০] সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৭৫

[৫১] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৪

থেকে তাঁদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজের সাথে আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ মূসা ﷺ-এর জন্য তাঁর লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেন, এমনকি তা জাদুকরদের লাঠি, রশি এবং আরও অনেক কিছুকে খেয়ে ফেলে। তাঁর জন্য সমুদ্রকে বিদীর্ণ করে দেন, আর তিনি নিরাপদে তা অতিক্রম করেন। তাঁর জন্য পানিতে বারোটি রাস্তা হয়ে যায়। তাঁকে এবং তাঁর কওমকে ছায়া দেওয়ার জন্য সাদা মেঘ পাঠিয়ে দেন। তা তাদের সাথে চলছিল। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করতেন। তাদের পিপাসা পেলে মূসা ﷺ পাথরে লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন। এর ফলে পাথর থেকে বারোটি ঝর্ণা নির্গত হতো। প্রত্যকে গোত্র তাদের পানের স্থান চিনত।

এরপর আল্লাহ বানী ইসরাঈল থেকে আরও অনেক নবী প্রেরণ করেন। তাদের কারও হাতের স্পর্শে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করে দিতেন। কারও হাতের স্পর্শে আল্লাহ অসুস্থকে সুস্থ করে দিতেন। কারও কাছে আল্লাহ গায়েবের বিষয় স্পষ্ট করে দিতেন। কারও জন্য অন্যান্য সৃষ্টিকে অনুগত করে দিতেন। কাউকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন অনেক ধরনের মুজিযা দিয়ে।

এ বিষয়ে জাতিসমূহ—ইহুদী, খ্রিষ্টানদের কাছে যে ঐশিগ্রন্থ আছে এবং তাদের কাছে নবী রাসূলদের সম্পর্কে যে সংবাদ আছে, তা এ বিষয়গুলোকে সত্যায়ন করে। তাদের কাছে শাইইয়া, আরমায়া, দানিয়াল, হুবকুক, দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-এর যেসকল পয়গাম ও বাণী আছে এবং 'সিফার আল-মুলক'-এর মতো অন্য যেসব কিতাব আছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বানী ইসরাঈল ছিল ভয়ানক অবাধ্য জাতি। তারা কখনও মূর্তির পূজা করত আবার কখনও আল্লাহর ইবাদত করত। কখনও বিনা কারণে আল্লাহর নবীদের হত্যা করত আবার কখনও আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে নিজেদের জন্য হালাল করে নিত। প্রথম দাউদ ﷺ-কর্তৃক তারা অভিশপ্ত হয়। তারপর এলো বাইতুল মাকদিসের ধ্বংস, সবাই এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। এর আগেও তিনি অনেককে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর মাতাকে আল্লাহ মানুষের জন্য নিদর্শন বানিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর কুদরতের প্রকাশ করার জন্য তাঁকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেন। এখানে চার ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আদম ﷺ-কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন পিতা-মাতা ছাড়া। হাওয়া

ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন কোনো নারী ব্যতীত। ঈসা ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ব্যতীত। বাদবাকি সকল মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেন পুরুষ ও মহিলার মাধ্যমে। ঈসা ﷺ এসেছিলেন মুজিযা নিয়ে। তিনি হাতের স্পর্শে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন মানুষরা কী খেয়েছে এবং তাদের বাড়িতে কী আছে। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথের দাওয়াত দিয়েছিলেন পূর্ববর্তী নবীদের মতো। তিনি আগের নবীদের সত্যায়ন করেছেন এবং পরে যিনি আসবেন তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন।

বানী ইসরাঈল সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতা করেছিল। অপরদিকে ঈসা ﷺ-এর অধিকাংশ কর্মেই ছিল দয়া, কোমলতা ও ক্ষমা। তাই আল্লাহ তাঁর অনুসারীদের অন্তরে দয়া ও করুণা ঢেলে দেন। তাদের অনেকে জ্ঞানলাভ করেছে আবার অনেকে হয়েছে সংসার-বিরাগী। ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে তারা ও হাওয়ারিগণ তিনভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম দল তাঁকে অস্বীকার করেছিল। তারা তাঁকে জারজ-সন্তান আখ্যা দেয়। তারা তাঁকে বেশ্যার সন্তান বলত এবং তাঁকে ইউসুফ নাজ্জারের সন্তান মনে করত। তাদের বক্তব্য ছিল—তাওরাতে প্রণীত শরীয়তের কোনো অংশই কখনও বাতিল হতে পারে না। এবং নবীগণের মাধ্যমে কোনো শরীয়ত বাস্তবায়ন হওয়ার পর আল্লাহ তা রহিত করেন না। খাবারদাবার ও মলত্যাগের ব্যাপারে তারা কোনো বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করত না। আরেকটি দল (তাঁর ব্যাপারে) মারাত্মক বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা ধারণা করতে থাকে ঈসা ﷺ নিজেই আল্লাহ এবং তিনিই আল্লাহর ছেলে। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মানুষের সকল পাপমোচন করার জন্য আল্লাহ তাঁকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি আদম ﷺ-এর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তারা ঈসা ﷺ-কে সার্বভৌম সত্তা সাব্যস্ত করেছে। অথচ আল্লাহর কোনো শরীক নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। ত্রিত্ববাদের কারণে আরেকটি দল বের হয়েছে।

এভাবে ত্রিত্ববাদ ও একত্ববাদের কারণে তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনো দলিল ছিল না। ইঞ্জিল-এ স্পষ্টভাবেই বর্ণিত ছিল, ঈসা ﷺ আল্লাহর বান্দা। তিনি এক আল্লাহর ইবাদত করেন, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে বিনীত হন।

দ্বীনের মূল বিষয় হলো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। নবী ﷺ নিজেই বলেছেন, যতক্ষণ-না মানুষ এই কথার সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল, ততক্ষণ পর্যন্ত

তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।[৫২]

নবী ﷺ আরও বলেছেন, "খ্রিষ্টানরা মারইয়ামের পুত্র ঈসার ব্যাপারে যেভাবে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আমার ব্যাপারে সেভাবে বাড়াবাড়ি কোরো না। আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই বোলো।"[৫৩]

দ্বীনের মূল বিষয় হলো আল্লাহর তাওহীদ মেনে নেওয়া এবং তাঁর রাসূলদের স্বীকার করা। এ জন্যই সাবিয়িনদের মতো মুশরিকরা নবুওয়তকে অস্বীকার করেছে। ইবাদত ও স্বীকৃতির ব্যাপারে তারা মুশরিক ছিল। আর রাসূলের ক্ষেত্রে তাদের আকীদা ছিল ভ্রান্ত। তারা রাসূলদের একত্ববাদের দাওয়াতের ব্যাপারে এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে অনেক ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এমন বিষয়কেও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা আল্লাহ-প্রদত্ত ফিতরাত এবং নবীগণের আনীত কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক।

তাদের এই ভ্রান্তির ফলে সাধারণ নেতৃবৃন্দ যেমন : পাদরি, বিশপ ও অন্যান্যরা বিশেষ-স্থান অর্জন করলে ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে সরে গিয়ে শাসকদের চাটুকার হিসেবে জীবনযাপন করতে থাকে। রাজত্ব ও সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা পেয়েই তারা সন্তুষ্ট। বাইতুল মুকাদ্দাসে এমন এক জন ছিল, যার নাম ইবনেল বুরি। দামেশকে এক জন ছিল, তার নাম ইবনেল কুফ। কনস্টান্টিনোপলের পোপের কথাও সবার জানা। বড় বড় বিশপ ও জাজকদের সাথে কথা বলতে গেলে বোঝা যায়, খ্রিষ্টান ধর্মের ওপর তাদের কোনো বিশ্বাস নেই। তারা তাদের অভ্যাস ও কর্তৃত্বশীল মনোভাবের কারণে ওই অবস্থার ওপর অটল রয়েছে, যেমনটা কোনো রাজা রাজত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং কোনো ধনী তার সম্পদকে আঁকড়ে ধরে থাকে। মূলত রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্যই তারা ধর্মের লেবাস পরিধান করে থাকে। এজন্য আপনি দেখবেন তারা গণিতশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে নিজেদের দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। ইবরাহীম ﷺ যাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন ওইসব ধর্মত্যাগী নাস্তিকদের মতো কথা বলায় তারা পারদর্শী। আসলে তারা ঈসা ﷺ ও পূর্ববর্তী নবীগণের ধর্মকে ছুড়ে ফেলেছে। রাজা-বাদশাহদের স্বার্থে ধর্মের সংস্কার-সাধন করেছে।

---

[৫২] বুখারী, আস-সহীহ : ২৪

[৫৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৩৫৪৯

পাদরি ও বিশপরা যে শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করত তাকে তারা আঁকড়ে ধরে এবং প্রথমদিকে ইহুদীদের সাথে বিবাদে জড়ায়। তারা তাদেরকে আদেশ দেয় ঈসা ﷺ তাওরাতের যে অংশ রহিত করেছেন তা ছাড়া বাকি অংশ আঁকড়ে ধরতে। তারা নবীদের ওপর চড়াও হয় এবং তাদের হত্যা করে। আরেক দল নবীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং তারা নবীদের মূর্তি বানিয়ে পুজো করে।

তারা বলত, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সময়ের আবর্তনে কিংবা অন্য কোনো নবীর কথায় তা কখনও রহিত হয় না। তারা বলত, পাদরি ও বিশপদের এই অধিকার আছে—তারা চাইলে ধর্মের যে-কোনো বিষয়ে পরিবর্তন আনতে পারবে। তারা চাইলে কাফফারা নিয়ে যে-কারও পাপ মোচন করতে পারবে। তাদের কেউ কেউ দাবি করে—তারা চাইলে নারীর দেহে পবিত্র আত্মা ফুঁকে দিতে পারে। পরে তারা লোবান প্রজ্জ্বলিত করে। এরা বলে, আমাদের জন্য অনেক কিছু হারাম করা হয়েছে। তারা আরও বলে, ছারপোকা থেকে হাতি পর্যন্ত সবকিছুই হালাল করা হয়েছে। সুতরাং যা ইচ্ছে খাও, যা ইচ্ছে বাদ দাও। একদল বলে, নাপাকি হলো পরিত্যাজ্য জিনিস। তাই ঋতুবতি মহিলার সাথে ওঠা-বসা করা যাবে না, তার সাথে খাওয়া যাবে না। আরেকদল বলে, কোনো জিনিসই নাপাক নয়। এজন্য তারা খতনা করতে বলে না। সহবাসের পর গোসল করতে বলে না। নাপাকি পরিষ্কার করতেও তাদের অনিহা। অথচ ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথিরা তাওরাতের যে শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাতে এই বিধান ছিল না।

তারা পূর্বদিকে ফিরে উপাসনা করে। অথচ ঈসা ﷺ এমনটা বলেননি। তার সহচরদের কেউ এমনটা করেনি। সম্রাট কনস্টানটাইন এই প্রথার আবিষ্কার করে। ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনাও কনস্টানটাইনের মস্তিষ্কপ্রসূত। তার দাবি—সে স্বপ্নের মাধ্যমে এই নির্দেশ পেয়েছে। অথচ ঈসা ﷺ নিজে তাঁর সহচরদের এ বিষয়ে কিছুই বলেননি।

যে দ্বীনের দ্বারা বান্দা আল্লাহর কাছে পৌঁছবে তা অবশ্যই আল্লাহর নাযিলকৃত হতে হবে। এ ছাড়া যা আছে সব বিদআত ও গোমরাহি। বিদআতের কারণেই মানুষ মূর্তিপূজা শুরু করেছে। নামাজে সুর-সংযুক্ত করাও বিদআত। ঈসা ﷺ ও তাঁর সহচরদের থেকে এসব কিছুই প্রমাণিত নয়।

মোদ্দা কথা, তারা যেসব উপাসনা করছে এর পক্ষে আল্লাহর কোনো আদেশ

নেই তাদের কাছে এবং এ নির্দেশ দিয়ে তিনি কোনো রাসূলও প্রেরণ করেননি। কিন্তু তাদের মধ্যে দয়া ও মায়া রয়েছে, এটা আল্লাহর দ্বীনের অংশ। যদিও পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ছিল বিপরীত। তাদের মধ্যে কঠোরতাও ছিল, যা আল্লাহ্ হারাম করেছিলেন। পূর্ববর্তীরা এ ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, যদিও তাদের মধ্যে অহংকার বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীরা হক থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তার ব্যাপারে অজ্ঞতায় পতিত হয়েছে।

আহলে কিতাব আলেমদের মধ্য থেকে অনেকেই অতীতে এবং বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছে। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে এসেছে। তারা আল্লাহর কিতাব থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়তের দলিল বের করেছে। তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলে এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা তারা অনুধাবন করেনি। হাওয়ারিগণও অনুরূপ ছিলেন। তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছিল। যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে সত্যপথ প্রদর্শন করেছিলেন।

ঈসা ﵇ ও পূর্ববর্তী নবীগণের দেওয়া সুসংবাদ অনুসারে যে নবী এসেছিলেন তিনি মানুষকে মিল্লাতে ইবরাহীম ও পূর্ববর্তী রাসূলদের দ্বীনের দিকে ডেকেছেন। তিনি মানুষকে ডেকেছেন এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে, যার কোনো শরিক নেই। তিনি দ্বীনের পথে ডেকেছেন একনিষ্ঠতার সাথে। তিনি মূর্তির উপাসনা থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করেছিলেন। দ্বীনকে পরিচ্ছন্ন করেছিলেন শিরক থেকে। সাধারণত মূর্তিপূজা হতো শামে এবং ইহুদীদের অন্যান্য ভূমিতে। বানী ইসরাঈল ও নাসারাদের দেশেও মূর্তিপূজা হতো। নবী ﷺ মানুষকে আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাব যেমন : তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর, ফুরকান (কুরআন) এবং আদম ﵇ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেন।

আল্লাহ্ বলেন,

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ آمَنُوا
بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ

اللَّـهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّـهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

"তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনোই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করি, যে একনিষ্ঠ ছিল এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাদের বংশধরদের ওপর এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে রবের পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তার ওপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। অতএব, তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তারাও যদি তেমন ঈমান আনে, তবে অবশ্যই তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে শুধু বিরুদ্ধাচারণেই ফিরে যাবে। সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। আমরা আল্লাহর রঙ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রঙের চাইতে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদত করি।" [৫৪]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"বলুন, হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা এমন বিষয়ের দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান—(আর তা হলো) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তা হলে বলে দাও, 'সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।" [৫৫]

---

[৫৪] সূরা বাকারা, ০২ : ১৩৫-১৩৮

[৫৫] আল ইমরান, ০৩ : ৬৪

আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

"কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম, পর্দার অন্তরাল অথবা এমন কোনো দূত পাঠানো ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করে। তিনি সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়।"[৫৬]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝

"কোনো মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'—এটা সম্ভব নয়। বরং সে বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও।' যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং নিজেরাও পড়তে। তা ছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলিম হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরির নির্দেশ দেবেন?"[৫৭]

আল্লাহ তাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং বাইতুল্লাহ'য় হাজ্জ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন ইবরাহীম খলিল ﷺ। তিনি ছিলেন নবীগণের পিতা এবং একনিষ্ঠ মুসলিমদের ইমাম। (আল্লাহ তাআলা) এই উম্মতকে করেছেন মধ্যমপন্থী। তারা আগের লোকদের মতো রাসূলদের ব্যাপারে ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করেনি। কিংবা নবীদেরকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন করেনি। অন্যেরা যেমন যে-কোনো কিছুকেই ইলাহরূপে গ্রহণ করে তাদের ইবাদত করেছে এবং সুপারিশকারী বানিয়েছে। অপরপক্ষে এই নবীর উম্মত

[৫৬] সূরা শুরা, ৪২ : ৫১

[৫৭] আল ইমরান, ০৩ : ৭৯-৮০

অন্যদের মতো আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি এবং সম্মানিত বিষয়কে খাটো করার মতো কষ্টদায়ক কাজে লিপ্ত হয়নি। বরং তারা নবীদেরকে সম্মানিত করেছে এবং নবীরা যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছে, তার আনুগত্য করেছে, ও (তাঁদের পথ) অনুসরণ করেছে এবং তাদেরকে ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছে। এবং তাদেরকে ভালোবেসেছে। তারা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করেনি এবং কারও ওপর ভরসাও করেনি। তারা আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে সাহায্য চায়নি এবং তার জন্যই দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে নিয়েছে।

তারা বলে, আল্লাহ আমাদের যা আদেশ করেছেন, আমরা তা মেনে চলি। তিনি আমাদের যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে আমরা বিরত থাকি। তিনি আমাদের জন্য এমন অনেক কিছু হালাল করেছেন যা আগে হারাম ছিল। যেমনভাবে ইয়াকূব ﷺ-এর জন্য যা হালাল করেছিলেন বানী ইসরাঈলের জন্য তা হারাম করে দিয়েছিলেন। এবং আমাদের জন্যও এমন অনেক কিছু হালাল করেছেন, যা আগে হারাম ছিল। যেমনিভাবে তিনি ঈসা ﷺ-এর জন্যও অনেক কিছু হালাল করেছিলেন যা বানী ইসরাঈলের ওপর হারাম ছিল। এসব হালাল-হারাম বিষয়ে আমরা শুনি এবং আনুগত্য করি।

নবীগণ ব্যতীত আর কারও আল্লাহর দ্বীনে পরিবর্তন করার কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ যার নির্দেশ দেননি এমন কিছু দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করানোর অনুমতি নেই। নবীগণ তা-ই বলেন, যা আল্লাহ তাঁদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ সকল বিষয়ের স্রষ্টা এবং সকল কর্তৃত্ব তাঁরই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ যেমন সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনই কোনো কর্তৃত্বও প্রদর্শন করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا
مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

"তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করো, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত কোরো না। এটাই ভারসাম্যপূর্ণ পথ।

কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।"[৫৮]

এই উম্মত সবদিকেই ভারসাম্য বজায় রাখে। পবিত্রতায়, অপবিত্রতায়, আখলাকে, হালালে, হারামে—সব ক্ষেত্রেই। তারা পূর্ববর্তীদের (ইহুদীদের) মতো কঠোরও নয়, পরবর্তীদের (খ্রিষ্টানদের) মতো কোমলও নয়। বরং তারা আল্লাহর শত্রুদের সাথে কঠোর, আল্লাহর ওলিদের সাথে কোমল। ঈসা ﷺ সম্পর্কে তারা তা-ই বলে, যা বলেছেন আল্লাহ, এবং যা বলেছিলেন ঈসা ﷺ ও তার হাওয়ারিগণ। যারা ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা আরোপ করেছে, এই উম্মত তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেনি।

হাওয়ারিরা শেষ নবী সম্পর্কে জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, তিনি প্রেরিত হবেন ইয়ামানের কোনো ভূমিতে এবং তাঁর হাতে থাকবে তরবারি। ঈসা ﷺ বলেছেন, তিনি সুস্পষ্ট নিদর্শন ও ব্যাখা-সহ আসবেন। নিশ্চয় ঈসা ﷺ সুস্পষ্ট প্রমাণ-সহ এসেছেন। এটা এমন বিষয় যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা জরুরি।

আমি জেনেছি, সম্রাটের ধার্মিকতা, আন্তরিকতা, সম্মান ও জ্ঞানতৃষ্ণা অনেক বেশি, আর আমি তার ব্যাপারে ভালোভাবেই অবগত আছি। আমি শায়খ আবুল আব্বাস আল মাকদিসিকে দেখেছি তিনি সম্রাটের নম্রতা ও ভদ্রতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বিশপদেরও প্রশংসা করেছেন।

আমরা প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করি। আমরা চাই, আল্লাহ আপনাদের মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ একত্র করে দিন। আল্লাহর সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো তাঁর সৃষ্টিকুলের কল্যাণ কামনা করা। এই নির্দেশ দিয়েই আল্লাহ তাআলা নবীদের প্রেরণ করেছেন। বান্দা ও তাঁর রবের মধ্যে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো কল্যাণ কামনা নেই। বান্দাকে অবশ্যই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং অবশ্যই বান্দার হিসাবনিকাশ নেবেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝

"যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের আমি জিজ্ঞাসা করবোই, এবং রাসূলদেরও জিজ্ঞাসা করব।"[৫৯]

দুনিয়ার বিষয়টি অতি সামান্য। দুনিয়ার বড় বিষয়ও অতি তুচ্ছ। এখানে মূল বিষয় সম্পদ ও রাজত্ব অর্জন করা। আর রাজত্ব অর্জনের মানে ফেরাউনের

[৫৮] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৪০
[৫৯] সূরা আ'রাফ, ০৭ : ০৬

পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। যাকে আল্লাহ তাআলা তার দলবল-সহ পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন। সম্পদের পরিণতি হয় কারুনের মতো যাকে আল্লাহ তাআলা মাটিতে গেঁথে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে নিচে যেতেই থাকবে। সে আল্লাহর নবী মূসা ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছিল।

ঈসা ﷺ-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবীরাও মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করার এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার এবং দুনিয়ার জীবনের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার আদেশ দিয়েছেন। দুনিয়া তুচ্ছ, তাই আমি ভেবেছি সম্রাটের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার হলো জ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা। এই আলোচনায় এমন সব বিষয়ের কথা বলব, যার ফলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সহজ হয়। উসুলের ওপর ভিত্তি করেই শাখাগত বিষয়ের আলোচনা হবে। আপনারা জানেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীন পূর্বসূরিদের রসম, শহুরে অভ্যাস, প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই রাসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং মানুষ যে-সকল বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে এবং মতানৈক্য করেছে, তা নিয়ে ভেবে দেখে। আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয় বিশুদ্ধ আকীদা ও সৎ আমলের মাধ্যমে। মানুষ যদি তার অন্তরের সব নেক ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নাও হয়, তবুও সে তার সমপরিমাণ কল্যাণ হাসিল করবে।

আমি যদি এ বিষয়ে সম্রাটের আগ্রহ দেখতে পাই, তা হলে আমি নিয়মিত তাকে লিখব এবং এ বিষয়ে তিনি যত প্রশ্ন করবেন সবগুলোর উত্তর দেব। আমার ইচ্ছা আছে দ্বীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে আমি সাইপ্রাস গমন করব। সম্রাটের কর্ম যেমন হবে, আমার আচরণও তেমন হবে। তার কর্ম যদি আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক হয়, তবে আমার আচরণও অনুরূপ হবে। সম্রাট ও তার অধীনস্তরা জানেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মুজিযা প্রকাশ করেছেন সাধারণভাবে আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুজিযা প্রকাশ করেছেন বিশেষভাবে, যার মাধ্যমে তিনি দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং কাফির ও মুনাফিকদের লাঞ্ছিত করেছেন।

তাতার সম্রাট গাযান তার বাহিনী নিয়ে দামেস্কে এলো। তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করত। কিন্তু তারা যা করেছে, তাতে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হননি। তারা আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেনি। আমি তার সাথে এবং তার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে নানাবিধ বিষয়ে অনেকবার আলোচনায় বসেছি, যার ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। আমি নিশ্চিত, সম্রাট এসব

জানেন। আল্লাহ তাআলা গাযান ও তার বাহিনীকে অপদস্থ করেছেন। সম্রাট এও জানেন, আমরা নিজ হাতে আঘাত করে ওদের পরাস্ত করেছি। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠকে উঁচু করেছি।

সিয়াসের বাদশাহ তুচ্ছ গোলামের মতো তাদের সাথে ছিল। আমাদের কিছু লোক প্রকাশ্যে তার সমালোচনা করত, কিন্তু সে প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। গাযানের মন্ত্রীরাই বলেছিল এই রাজা তার কুমতলবের কারণে লাঞ্ছিত হয়েছে। আপনার দূতরা যখন উপকূলে এলো, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাতাররা সিয়াসের রাজাকে ভীষণ অপমান করছিল। তবে আমরা আপনাদের ধর্মানুরাগীদের সাথে সদাচারণ করেছি। এবং তাদের ওপর (আক্রমণ করা) থেকে বিরত থেকেছি।

খ্রিষ্টানরা জানে আমি বন্দিদের মুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাতারদের আহ্বান করেছি। গাযান ও কাতলু শাহ তাদের মুক্ত করে দিয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজনের সাথে (বন্দিদের) মুক্তির বিষয়ে আমার কথাবার্তা হয়। সে শুধু মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে সম্মত হয়। সে আমাকে জানায়, আমাদের কাছে কিছু খ্রিষ্টান বন্দি আছে যাদেরকে আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আটক করেছি। তারা মুক্তি পাবে না।

এ পর্যায়ে আমি তাকে বললাম, তোমাদের কাছে যত ইহুদী-খ্রিষ্টান জিম্মি হয়ে আছে, তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিতে হবে। আমি বারবার বলেছি—আমরা সকল বন্দি, সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, সবাইকে মুক্ত করব। কাউকেই তাতারদের হাতে বন্দি রাখব না। এভাবে আমরা প্রচুর খ্রিষ্টান বন্দিদের মুক্ত করেছি। এটা আমাদের কাজ ও ইহসান, আর আল্লাহই এর প্রতিদান দেবেন।

একইভাবে খ্রিষ্টানদের যেসব লোক আমাদের হাতে বন্দি ছিল, তাদের সবাই আমাদের কাছে থেকে ইহসান, দয়া ও কোমল আচরণ পেয়েছে। নবীজি ﷺ আমাদের এর আদেশ দিয়েছেন এভাবে, তোমরা সালাত আদায় করো এবং তোমাদের অধীনে যারা আছে তাদের হক আদায় করো। কুরআন বলছে,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨

> "খাদ্যের প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও তারা অভাবী, এতিম ও বন্দিদের খাদ্য দান করে।"[৬০]

[৬০] সূরা ইনসান, ৭৬ : ০৮

তাতাররা মুসলিম মিল্লাতের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করা এবং দ্বীনকে মেনে নেওয়া দাবি করেছে। (তাতারদের সীমাহীন অন্যায়-অবিচার সত্ত্বেও) আমরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। মুনাফিকিও করিনি। আমরা বারবার তাদের বলেছি, তারা (জমিনে) ফাসাদ সৃষ্টি করেছে এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে, যার কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক।

শাম ও মিশরের সেনারা (তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এখনও) অবিচল রয়েছে। তারা তাতারদের ভয় করে না। আর তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত বিজয় অর্জন করে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, তাতাররা মুসলিম হয়ে গেছে। ফলে (মুসলিম) সেনাবাহিনী জিহাদ থেকে বিরত থাকে। এই সুযোগে তাতাররা ১০ হাজারের বেশি মুসলিমকে হত্যা করে। অপরদিকে মুসলিমরা তাতারদের মাত্র দুইশো জনকে হত্যা করেছিল। তারপর মুসলিম সেনাবাহিনী যখন মিশর এসে উপস্থিত হয়, তখন অভিশপ্ত তাতার-বাহিনীর অরাজকতা ও দ্বীন-বহির্ভূত কাজের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছয়। ফলে আল্লাহর সৈনিকরা আবার (যুদ্ধে) বের হয়। জমিন ও পাহাড় তাদের পদভারে ভারী হয়ে ওঠে। সংখ্যার আধিক্যে, শক্তিতে, সততায় তারা ছিল অনন্য। এই বিশাল জামাআত দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। এবং এই ফেরেশতাদের দ্বারা হকপন্থী উম্মত বরাবরই সাহায্য পেয়ে আসছে। তাতাররা তাদের মোকাবিলায় দাঁড়াতেই পারেনি, তারা তাদের হাতে পরাজিত হয়।

এরপর তাতাররা পুনরায় হামলার চেষ্টা করে। আল্লাহ তাদের ওপর গজব পাঠান। তাদের সকল ঘোড়া মারা যায়। তারা হতাশ হয়ে পালিয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বাস্তবায়ন ঘটান এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন।

আল্লাহর এই বান্দা এখন নানা বিপদে আছে। একের-পর-এক সমস্যা ঘিরে ধরেছে। কিন্তু ইসলামের মান ও মর্যাদা দিন দিন বেড়েই চলছে। নবীজি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক পাঠাবেন যিনি সংস্কারমূলক কাজ করবেন।

এই দ্বীন নব-উদ্যমে এগিয়ে চলছে। আমি সম্রাট ও তার সভাসদদের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহর শপথ! তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যিনি তাওরাত ইঞ্জিল, ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন।

সম্রাট জানেন নবীজির কাছে নাজরানের প্রতিনিধি-দল এসেছিল। তারা

সকলেই ছিল খ্রিষ্টান। তাদের মধ্যে পাদরিরাও ছিল। নবী ﷺ তাদেরকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের দিকে আহ্বান জানান।

তারা (নবীজির সাথে) ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে যখন তর্কে লিপ্ত হলো, তখন নানা যুক্তি প্রমাণ-পেশ করল। যখন তাদের সামনে প্রমাণ পেশ করা হলো, তখন তারা কথা ঘুরাতে লাগল। আল্লাহ তাআলা নবীজিকে মুবাহালার[৬১] আদেশ দেন। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

"অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এ সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তা হলে বলো—এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের সন্তানদের। আর আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে বিনীত প্রার্থনা করি এবং মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত দিই।"[৬২]

নবী ﷺ মুবাহালার কথা বললে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নেয়। তারা বলল, আমরা জানি তিনি নবী। যদি কেউ নবীর সাথে মুবাহালা করে, তবে নবীই তাতে সফল হন। তাই পরামর্শের পর তারা জিম্মি হিসেবে জিযিয়া দিতে সম্মত হয় এবং তারা মুবাহালা থেকে মাফ চায়।

নবী ﷺ সম্রাট কায়সারের কাছে পত্র পাঠিয়েছেন। এই কায়সার ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বাদশাহ। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। বিভিন্ন কিতাবাদি পাঠে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, ইনিই সত্য নবী যাঁর ব্যাপারে ঈসা ﷺ সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনিই সে নবী, যাঁকে ইবরাহীমের

[৬১] যখন দুজন ব্যক্তি পরস্পরবিরোধী দাবি করে এবং প্রত্যেকেই নিজের বক্তব্যকেই সঠিক ও অপরের বক্তব্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে; তখন তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর গজব কামনা করতে পারে এই বলে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার ওপরে যেন আল্লাহর গজব নাযিল হয়।
এ পদ্ধতিকেই মুবাহালা বলা হয়। এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি সুন্নাহ। ইমাম ইবনে কায়্যিম ﷺ বলেছেন, "মিথ্যাবাদীদের সাথে বিতর্কের সময় মুবাহালা করা সুন্নাহ-সম্মত পদ্ধতি।" (অনুবাদক)

[৬২] সূরা আল ইমরান, ০৩ : ৬১

পুত্র ইসমাঈলের বংশে প্রেরণের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন। সম্রাট তার জাতিকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করেন, নবীজির চিঠির প্রতি সম্মান জানান, চিঠিতে তিনি চুমু খান, চোখের ওপর লাগান। তিনি বলেছিলেন, যদি আমি তাঁর কাছে পৌঁছার ব্যাপারে নিশ্চিত হতাম, তা হলে আমি তার সাক্ষাতের প্রত্যাশা করতাম। আমি তাঁর কাছে গেলে তাঁর দুই পা ধুয়ে দিতাম। অচিরেই আমার এ রাজত্ব তাঁর দুই পায়ের নিচে চলে যাবে।

হাবশার সম্রাট নাজ্জাশিও খ্রিষ্টান ছিলেন। যে-সকল সাহাবি হাবশায় হিজরত করেন তাদের থেকে তিনি নবীজির কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছিলেন। তিনি মুহাজির সাহাবিদের সাথে তার ছেলেকে নবীজির কাছে পাঠান। নাজ্জাশির মৃত্যুর পর নবী ﷺ তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। নাজ্জাশি সূরা মারইয়াম শোনার পর ক্রন্দন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মুসলিমরা ঈসা ﷺ সম্পর্কে যা বলে, ঈসা ﷺ নিজেও নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু বলেননি।

নবী ﷺ-এর নীতি ছিল নাসারাদের কেউ যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং তাঁর কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনে, তবে সে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে। একজন মুসলিমের যে অধিকার, সেও একই অধিকার পাবে। একজন মুসলিমের যে দায়িত্ব, তারও সে দায়িত্ব। আর তাদের জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান। একদিকে ঈসা ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য, অপরদিকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য।

কোনো জাতির কেউ যদি আল্লাহর ওপর ঈমান না আনে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তার বিরুদ্ধে কিতালের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ
وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ
عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ওই লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য-দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।"[৬৩]

[৬৩] সূরা তাওবা, ০৯ : ২৯

ঈসা ﷺ সত্যনিষ্ঠ উম্মতের সাথে কখনোই জিহাদের নির্দেশ দেননি এবং হাওয়ারিগণও এই নির্দেশ প্রদান করেননি। অতএব হে সম্রাট! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের পক্ষ থেকে আগত কোনো দলিল ব্যতীত আপনি কীসের ভিত্তিতে রক্তপাত, স্বাধীন মানুষকে বন্দি ও সম্পদ লুণ্ঠনের বৈধতা দিতে পারেন! সম্রাট আপনি জানেন, আমাদের দেশে বহু খ্রিষ্টান জিম্মি নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছে। তাদের সংখ্যা কত, তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। আর আমরা তাদের সাথে কেমন সদাচরণ করছি, তা সবারই জানা। তা হলে কীভাবে খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের সাথে এমন আচরণ করছে, যাতে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কিংবা দ্বীনদার মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না! আমি আপনার ও আপনার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে কিছু বলছি না। কারণ আমি দেখেছি শায়খ আবুল আব্বাস আপনাদের অনেক প্রশংসা করেছেন। আমি কথা বলছি আপনার অধীনে যারা আছে, তাদের ব্যাপারে। মুসলিম বন্দিরা কি আপনার অধীন নয়? ঈসা ﷺ কি তাদের সাথে সদাচারণের আদেশ দেননি? তা হলে কোথায় সেই সদাচারণ?

আপনারা অনেককেই বন্দি করেছেন বিশ্বাসঘাতকতা করে। বিশ্বাসঘাতকতা সকল ধর্ম, শরীয়ত ও রাষ্ট্রনীতি অনুসারে অবৈধ। সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বন্দি করে স্বাধীনতা নষ্ট করাটা কীভাবে বৈধ হতে পারে! আপনারা কি ধরে নিয়েছেন, মুসলিমরাও আপনাদের মতো বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নেবে, আর আপনাদের প্রতারিত করার পরও আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন? না তা কখনোই নয়। কারণ, এই উম্মত জিহাদের জন্য বের হয়েছে এবং লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে। আর (এই উম্মতের) নেককার বান্দা ও আল্লাহর ওলিগণ আল্লাহর আনুগত্যে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছে। বীর সেনানীরা সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ইতিমধ্যেই তাদের কর্মতৎপরতার কিছু আলামত প্রকাশিত হয়েছে, এবং তা আরও বৃদ্ধি পাবে। মুসলিমদের মধ্যে এমন নেককার লোক রয়েছে, যাদের দুআ আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। তাদের চাওয়াগুলো বিফল করেন না। তারা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, তারা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাতারদের সৈন্য সংখ্যা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমরা তাদের ওপর চড়াও হয় এবং চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন এমন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে, যা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়।

সুতরাং হে সম্রাট! আপনিই বলুন, মুসলিমরা কীভাবে তাদের সাথে সদাচরণ করতে পারে, যখন তারা চতুর্দিক থেকে মুসলিমদের ঘিরে রেখেছে, যা কোনো

বুদ্ধিমান মানুষ, চুক্তিবদ্ধ লোক এবং মুসলিমরা মেনে নিতে পারে না? তা ছাড়া আপনি এও জানেন, মুসলিমদের মূলত কোনো অপরাধ নেই। তারা যা করেছে, তাতে তারা প্রশংসার যোগ্য। জ্ঞানীরা যার শ্রেষ্ঠত্বের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছে, সেটাই মুসলিমদের দ্বীন। এমনকি দার্শনিকরাও একমত যে, বিশ্বে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো দ্বীন নেই। আমাদের প্রতিটি কাজই সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

সম্রাট! আপনি জানেন, উপকূলীয় এলাকাগুলো-সহ এই দেশগুলো মুসলিমদের অধীনে ছিল। এই সাইপ্রাস তাদের হাতছাড়া হয়েছে মাত্র তিনশো বছর হলো। নবী ﷺ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমরাই জয়ী থাকবে। তা হলে সম্রাট কী করে ভাবলেন, মুসলিমদের বন্দি করা হবে আর অন্য অঞ্চলের মুসলিমরা চুপচাপ বসে থাকবে? আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন, মুসলিমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে না? এবং অন্যদের থেকে যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে, তা আপনাদের থেকে গ্রহণ করবে না?

যদি সম্রাট ও সভাসদদের থেকে উত্তম আচরণ পাই, তবে আমরাও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করব। এরপরও যদি কেউ অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আপনি জানেন, নিশ্চয় উপরিউক্ত কাজগুলো করা মুসলিমদের জন্য খুবই সহজ। আপনাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, জ্ঞান-অন্বেষণে সহায়তা করা, হকের অনুসরণ করা, অবশ্যপালনীয় কাজে সাহায্য করাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। সম্রাটের কাছে যদি এমন কেউ থাকে যিনি জ্ঞানের মৌলিক নীতিমালা এবং ধর্মসমূহের হাকীকত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, তা হলে তাকে সাথে নিয়ে আপনি সত্যের সন্ধান করতে পারেন। দয়া করে খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে অন্ধ অনুসারীদের কথায় সন্তুষ্ট হবেন না—যারা শোনেও না, বোঝেও না। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট।

মোদ্দা কথা, আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্য ও হিদায়াত কামনা করুন। আপনি বলুন—

اللَّهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا، وَوَفِّقْنِي لِاتِّبَاعِهِ، وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا، وَوَفِّقْنِي
لِاجْتِنَابِهِ، وَلَا تَجْعَلْهُ مُشْتَبِهًا عَلَيَّ، فَأَتَّبِعَ الْهَوَى

"হে আল্লাহ! আমার সামনে সত্যকে সত্যরূপে তুলে ধরুন। এবং তা অনুসরণ করার তৌফিক দিন। আমার সামনে মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে

তুলে ধরুন এবং এর থেকে দূরে থাকার তৌফিক দিন। আমার জন্য (বাতিলকে) অস্পষ্ট করবে না, তা হলে আমি প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়ে যাব।"[৬৪]

আপনি আরও বলুন,

اللَّهُمَّ، رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! যেসব বিষয় নিয়ে তোমার বান্দারা মতবিরোধে লিপ্ত, তাদের মধ্যে তুমিই ফয়সালা করে দেবে। যে সত্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তোমার অনুগ্রহে আমাকে তার দিশা দাও। তুমি যাকে চাও, তাকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকো।"[৬৫]

চিঠিতে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। আমি চাই সম্রাট দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হোন। দুটি বিষয় খেয়াল করা দরকার। প্রথমটি শুধু সম্রাটের জন্য। আর তা হলো—দ্বীনি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, সত্য উদ্‌ঘাটন করা, সংশয় নিরসন করা এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইবাদত করা। পুরো দুনিয়ার রাজত্ব থেকেও এগুলো আপনার জন্য কল্যাণকর। আলাহ তাআলা ঈসা ﷺ-কে এই আদেশগুলো দিয়েই প্রেরণ করেছেন আর তার সাথিরাও (হাওয়ারিগণ) এই শিক্ষাই দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি সম্রাট ও মুসলিম জনসাধারণের জন্য প্রযোজ্য। আর তা হলো—আপনার দেশের বন্দি মুসলিমদের সাহায্য করা, তাদের প্রতি ইহসান করা, মুসলিম বন্দিদের প্রতি সদাচারণ করার জন্য প্রজাদের নির্দেশ দেওয়া এবং তাদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করা। মুসলিম বন্দিদের সাথে নির্মম আচরণ করাটা আপনার ধর্ম ও আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী গর্হিত অপরাধ। আর মুসলিমদের কাছেও এটা ঘুরতর অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করাটা আপনার ধর্ম ও আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী বিরাট পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হবে। মুসলিমদের কাছেও তা মহৎকাজ বলে বিবেচিত হবে। ঈসা ﷺ এই ব্যাপারে

[৬৪] মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/১৯

[৬৫] তিরমিযী, আস-সুনান : ৩৪২০; সহীহ।

মানুষকে সবচেয়ে বেশি নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো খ্রিষ্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এমন একদল মানুষকে বন্দি করেছে, যারা তাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়নি। অথচ ঈসা ﷺ বলেছেন, কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে তার জন্য বাম গাল এগিয়ে দাও। কেউ তোমার চাদর কেড়ে নিলে, তাকে নিজের জামা দিয়ে দাও। আপনাদের কাছে প্রতিনিয়ত মুসলিম বন্দিদের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে আল্লাহর ক্রোধ ও মুসলিম বান্দাদের ক্রোধ দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাইপ্রাসে যে-সকল বন্দি মুসলিম আছে, তাদের মুক্তির ব্যাপারে (কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে) আমরা কীভাবে নিশ্চুপ বসে রইব? অথচ এদের বেশিরভাগই দুর্বল ও দরিদ্র মুসলিম। তাদের জন্য চেষ্টা-তদবির করার মতো কেউ নেই।

এই যে আবুল আব্বাস, তিনি একজন দরিদ্র মুসলিম, ইবাদতগুজার, বৃদ্ধ। অনেক কষ্টে তাকে মুক্ত করা গেছে। ইসলাম আমাদের দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করার আদেশ দেয়। এসব ইস্যুতে আমাদের সাহায্য করাটা সম্রাটেরই দায়িত্ব। আর সূর্য ও বৃষ্টির মাধ্যমে যেভাবে কল্যাণ সাধিত হয় সেভাবে সবার ওপর সীমাহীন দয়া ও কল্যাণের জন্য ইঞ্জিলে নির্দেশ দিয়েছেন ঈসা ﷺ। সম্রাট ও সহযোগীরা যদি বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করেন, তা হলে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান পাবেন। এই ভালো কাজের জন্য আল্লাহ আখিরাতে তাদের সওয়াব ও প্রতিদান দেবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেসব খ্রিষ্টান পাদরিরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন না, তাদের কাছেও বিষয়টি স্পষ্ট। বরং যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ইনসাফের মানসিকতা লালন করে, তারা ভালো করেই জানে যে, এসব মুসলিমদের অন্যায়ভাবে বন্দি করা হয়েছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথিদের এ নির্দেশ দেননি যে, তারা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী কাউকে বন্দি করবে কিংবা হত্যা করবে। যখন সাধারণ খ্রিষ্টানরা পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তবে তাঁর অনুসারীদের হত্যা করাটা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

খ্রিষ্টানদের এমন অনেক রাজা-বাদশাহ-বিদ্বান-পাদরি ও সাধারণ মানুষ রয়েছে, যারা জ্ঞান ও ধার্মিকতায় অনন্য। তারা কিছু অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং তা আদায়ে তৎপর। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের কদর বোঝে, যা অন্যেরা বোঝে না। তারা মুসলিমদের সাথে এমন সদাচরণ করেন, যার মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হয়। এ ছাড়া বন্দি এবং দাসদের মুক্ত করার

ফযীলত সম্পর্কে অনেক নবী এবং সিদ্দীকগণের বক্তব্য রয়েছে। আর এই বিষয়গুলো তাদের কাছে স্পষ্ট। সম্রাট মুসলিম বন্দিদের সাথে যেমন আচরণ করবেন, তেমন প্রতিদান পাবেন।

মনে রাখুন, মুসলিমদের দেশে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের সংখ্যা আপনার কাছে বসবাসরত মুসলিমদের চেয়ে অনেক বেশি। এর মধ্যে খ্রিষ্টানদের বড় বড় নেতারাও আছে। এমন নেতা আপনাদের মাঝে কমই আছে। অপরদিকে মুসলিম বন্দিদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ওপর মুসলিম উম্মাত নির্ভর করে কিংবা যার দ্বারা সকল মুসলিম উপকৃত হতে পারে। তবুও আমরা কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধানকারী সত্যবাদীরা (কিয়ামতের দিন) প্রতিদান পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

আবুল আব্বাস আমার এই চিঠি নিয়ে যাবেন। তিনি আমাদের কাছে সম্রাট ও তার ভাইয়ের ভালো কাজের প্রশংসা করেছেন । তার কথা শুনে আমরা সম্রাটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এজন্যই আমি সম্রাটকে চিঠি লিখছি। আমি তার কাছে সম্রাটের জ্ঞান ও ধর্মীয় বিষয়ে জানার আগ্রহের কথা শুনেছি। আমি সম্রাট ও তার সহচরদের কল্যাণ কামনায় ঈসা ﷺ ও সকল নবীদের প্রতিনিধিত্ব করছি।

নিশ্চয় উম্মতে মুহাম্মাদ মানব-জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা সৃষ্টি-জগতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে, তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং তাদের দ্বীনি-দুনিয়াবি কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করে। সম্রাটের কাছে যদি এমন সংবাদ পৌঁছে যে, আপনাদের কাউকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে, আপনাদের ধর্মের ওপর অববাদ দেওয়া হয়েছে, তা হলে বুঝতে হবে—এ সংবাদ মিথ্যা অথবা (এই সংবাদ যে পৌঁছিয়েছে, সে) বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। সে যদি সত্যবাদীও হয়, তারপরও বিভিন্ন প্রকার নাফরমানী, অশ্লীলতা ও জুলুম দ্বারা আক্রান্ত। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এমন লোক পাওয়া যায়। তবে মুসলিমদের মধ্যে যে অনিষ্টতা রয়েছে, তা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক কম। আর মুসলিমদের মধ্যে যে কল্যাণকামিতা রয়েছে, তা অন্য কোনো জাতির মধ্যে পাওয়াটা দুষ্কর।

সম্রাট ও প্রত্যেক জ্ঞানীরাই জানেন—অধিকাংশ খ্রিষ্টানই ঈসা ﷺ-এর

আদেশ থেকে সরে গেছে। তারা সেন্ট পল ও অন্যান্যদের লিখিত উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাদের মধ্যে যে খ্রিষ্টধর্মের চর্চা রয়েছে—তা প্রচুর মদপান, শুকরের মাংস খাওয়া, ক্রুশবিদ্ধ কাঠকে সম্মান জানানো, আল্লাহর নাযিলকৃত দলিল-প্রমাণের বাইরে গিয়ে নতুন নতুন বিদআত আবিষ্কার করা ও কুসংস্কার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খ্রিষ্টধর্ম যা নিষিদ্ধ করেছে, তাদের অনেকেই তা বৈধ করে নিয়েছে। আবার (নির্লজ্জের মতো) এসব তারা স্বীকারও করে। কিন্তু তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো মেনে নেয় না। সত্যবাদী রাসূলের কাছ থেকে আমাদের কাছে এ মহান সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে যে, মারইয়ামের পুত্র ঈসা ﷺ দামেস্কের শুভ্র মিনারে অবতরণ করবেন। তার দুই হাত থাকবে দুই ফেরেশতার কাঁধের ওপর। তিনি ক্রুশবিদ্ধ কাঠটি ভেঙে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযিয়া আদায় করবেন, ইসলাম ছাড়া কারও থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না। মিথ্যা মাসিহ কানা দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ইহুদীরা হবে দাজ্জালের অনুসারী। মুসলিমরা ইহুদীদের ওপর হামলা করবে। গাছ এবং পাথরও সেদিন বলে দেবে, 'হে মুসলিম! এই যে আমার পেছনে একজন ইহুদী। ওকে হত্যা করো।'

সত্যের হিদায়াত দিয়ে ঈসা ﷺ-কে ইহুদীদের কাছে পাঠানো হলে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তাকে কষ্ট দিয়েছিল। এ-জন্য আল্লাহ ইহুদীদের শাস্তি দেবেন।

আমি সম্রাটকে বলব—(খ্রিষ্টানদের মধ্যে) যারা মুসলিমদের সাথে সদাচার করেছে ও অনুরাগ দেখিয়েছে, তাদের সাথেও ঠিক ততটুকুই সদাচার করা হবে, যতটা তারা মুসলিমদের সাথে করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখবে। অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও দেখবে।

আমার চিঠি এখানেই শেষ। আমি শায়খ আবুল আব্বাস ও অন্যান্য বন্দির প্রতি সদাচার ও সহযোগিতা করার নির্দেশ দিচ্ছি। কুরআনের অনুসারীদের সাথে যেন কোমল ব্যবহার করা হয়। কাউকে যেন জোর করে ধর্মান্তরিত না করা হয়। সম্রাট অতি শীঘ্রই এসব কাজের পরিণতি দেখতে পাবেন।

সম্রাট মনে মনে এসকল কাজের যতটা প্রতিদান আশা করেন, তার কয়েকগুণ বেশি আমরা তাকে দেব। আল্লাহ নিশ্চয় জানেন, আমি কেবল সম্রাটের কল্যাণই চাই। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাদের কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকামনাকে শরীয়তে বিধিবদ্ধ করেছেন।

আমরা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া-প্রদর্শন করি, এবং তাদেরকে আল্লাহ ও দ্বীনের দিকে ডাকি। তাদেরকে মানুষ ও জিন শয়তান সম্পর্কে সচেতন করি।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি সম্রাটকে এমন কল্যাণকর কাজে সহায়তা করুন, যা আল্লাহর কাছেও কল্যাণকর। এবং আপনাকে কল্যাণকর কথা বলার তৌফিক দান করুন। আর আপনার শেষ পরিণতি শুভ করুন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। আল্লাহর সকল নবী ও রাসূলের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। বিশেষ করে শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার বিরুদ্ধে কিছু লোকের অসংযত মন্তব্য এবং তাকে কষ্টপ্রদান, তার প্রতি শাসকদের অনভিপ্রেত হুমকি ধমকি—এসব কিছুর পেছনে কাজ করছিল শায়েখের প্রতি তাদের হিংসা আর বিদ্বেষ। এ কারণে বাধ্য হয়ে ইবনে তাইমিয়্যা আত্মিক ব্যাধি এবং অন্তরের সংক্রামক-জীবাণু নিয়ে মুখ খোলেন।

রিসালাহ-৮

আত্মিক ব্যাধি ও তার প্রতিকারের বর্ণনা দিয়ে লেখা পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন যে,

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا

"তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।"[৬৬]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

"আমি নাযিল করেছি কুরআন; যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত। কিন্তু তা জালিমদের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[৬৭]

দৈহিক ব্যাধি সুস্থতার বিপরীত। তেমনিভাবে অন্তরেরও ব্যাধি রয়েছে, (যা ব্যক্তিকে অসুস্থ করে তোলে) আর এই অন্তরের রোগ সৃষ্টি হয় দ্বীনের প্রতি সন্দেহ-সংশয় থেকে নয়তো প্রবৃত্তির তাড়না থেকে।

যেমন : মুজাহিদ আর কাতাদা রহিমাহুমাল্লাহ (فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ)-এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে মানে তাদের (দ্বীনের ব্যাপারে) সন্দেহ-সংশয় রয়েছে।

---

[৬৬] সূরা আল-বাকারা, ০২ :১০
[৬৭] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৮২

আবার কখনও কখনও ব্যাধির তাফসীর দ্বারা 'ব্যভিচারের কামনা' বোঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে,

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

"যাদের দিলে ব্যাধি আছে তারা লালসা করে।"[৬৮]

আত্মার ব্যাধি মূলত অন্তরে–তৈরি–হওয়া এক প্রকারের যন্ত্রণা। এর উদাহরণ হলো : যে শত্রু আপনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে, তার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার ন্যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ

"তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত করবেন এবং তাদের হৃদয়ের ক্ষোভ দূর করবেন।"[৬৯]

তা ছাড়া সন্দেহ, সংশয় এবং অজ্ঞতা অন্তরকে ব্যথিত করে তোলে। তাই তো নবী ﷺ বলেন,

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

"তারা কেন জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিল না? কারণ অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞেস করা।"[৭০]

যে আলেম উত্তর প্রদানের মাধ্যমে হককে ফুটিয়ে তোলেন, তার ব্যাপারে বলা হয়—তিনি উত্তরের মাধ্যমে আমাকে উপশমিত করেছেন।

সুষম খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের পরিচর্চা যেমন জরুরি, তেমনই আত্মারও পরিচর্যার দরকার হয়, যেন তা পরিপূর্ণতা ও সংশোধনের পথে এগোতে পারে। আল্লাহর পথে ব্যয় গুনাহকে ওইভাবেই নিঃশেষ করে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। তেমনিভাবে সদাকার মাধ্যমেও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

[৬৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২

[৬৯] সূরা তাওবা ০৯ : ১৪-১৫

[৭০] আবু দাউদ, আস-সুনান : ৩৩৬; হাসান।

"আপনি তাদের সম্পত্তি থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যা তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে।"[৭১]

এভাবে অশ্লীল কাজ পরিহার করার মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

"এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তা হলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতে না।"[৭২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

"দুর্ভোগ ওই সকল মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত প্রদান করে না।"[৭৩]

শিরকের বিপরীতে তাওহীদ এবং ঈমান বান্দার অন্তরকে বিশুদ্ধ করে তোলে।

তাই তো ইয়াহ্ইয়া ইবনে আম্মার বলেন, জ্ঞান পাঁচ প্রকার।

(১) ইলমুত-তাওহীদ :

এই প্রকারের জ্ঞান দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার মতো। (দুনিয়ার জীবনে বাঁচতে হলে যেমন হায়াতের প্রয়োজন, তেমনিভাবে ঈমানকে বাঁচাতে হলে তাওহীদের জ্ঞানের প্রয়োজন)।

(২) ইলমুত-তাযাক্কুর বি-মা'আনিল কুরআনি ওয়াল-হাদীস :

অর্থাৎ এই প্রকারের জ্ঞান হলো দ্বীনের রসদ। আর তা হলো কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা।

---

[৭১] সূরা তাওবা, ০৯ : ১০৩
[৭২] সূরা আন-নূর, ২৪ : ২১
[৭৩] সূরা ফুসসিলাত ৪১ : ৬-৭

(৩) ইলমুল ফাতওয়া :

এই প্রকারের জ্ঞানকে আমরা দ্বীন ও শরীয়তের ওষুধ বলতে পারি। যখন বান্দার মধ্যে নতুন কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন এই প্রকার জ্ঞান তাকে সে সমস্যা থেকে মুক্তি দান করে।

(৪) ইলমুল কালাম :

এই প্রকারের জ্ঞান হলো দ্বীনের মধ্যে অসুস্থতার মতো।

(৫) ইলমুস-সিহর (জাদুবিদ্যা) :

এই প্রকারের জ্ঞান দ্বীনকে ধ্বংসকারী।

সালাফদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, "প্রতিটি নেককাজ অন্তরকে আলোকিত করে তোলে, শরীরে শক্তি সঞ্চার করে, চেহারায় জ্যোতি এনে দেয়, রিযিককে প্রশস্ত করে তোলে, মানুষের অন্তরে ভালোবাসা এনে দেয়। অপরদিকে প্রত্যেকটা পাপকাজ আত্মাকে কলুষিত করে তোলে, চেহারাকে মলিন করে দেয়, দেহে অবসাদ তৈরি করে, রিযিককে সঙ্কীর্ণ করে ফেলে এবং মানুষের অন্তরে ঘৃণা এনে দেয়।"

এটিই হলো আত্মাকে প্রাণবন্ত করার এবং জীবনকে আলোকিত করার মৌলিক নীতি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا।

> "আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেখান থেকে বেরোতে পারছে না?"[৭৪]

মুমিনদের অন্তরের ঈমানি নূরের উপমা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[৭৪] সূরা আনআম, ০৬ : ১২২

اللَّـهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ

"আল্লাহ হলেন আসমান ও জমিনের নূর। তাঁর নূরের উপমা এমন—যেন একটি দীপাধার, যাতে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত। কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র-সদৃশ্য। তা বরকতময় জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বদিকেরও নয় এবং পশ্চিমদিকেরও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলো বিকিরণ করে। নূরের ওপর নূর।"[৭৫]

এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআটিও পাঠ করতেন,

رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ

"(হে আল্লাহ)! আপনি কুরআনকে আমাদের অন্তরের কল্যাণকর বারিধারায় পরিণত করুন এবং আমাদের বক্ষসমূহের নূর বানিয়ে দিন।"[৭৬]

"রবী" বলা হয় আকাশ-থেকে-বর্ষিত-হওয়া বৃষ্টিকে যার দ্বারা শস্য উৎপন্ন হয় এবং সবুজ-শ্যামলতা ছড়িয়ে পড়ে। আর হৃদয়ে-তৈরি-হওয়া নূরের কারণে সে শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং অনুধাবনও করতে পারে। আর (পাপাচারের কারণে) যে অন্তর মরে গেছে, সে শুনতে পায় না দেখতেও পায় না।

কাফিরদের বক্তব্যকে কুরআনুল কারীম এভাবে বর্ণনা করেছে,

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ۝

"তারা বলে, তোমরা আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করো, সেদিক থেকে আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত এবং আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা, আর তোমাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে রয়েছে পর্দা। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো আর আমরাও আমাদের কাজ

[৭৫] সূরা নূর, ২৪ : ৩৫
[৭৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ৪৩১৮; দুর্বল।

করি।"[৭৭]

যে ব্যক্তির হৃদয় জীবন্ত তার ভেতরে লজ্জা ক্রিয়াশীল থাকে, যা তাকে সকল প্রকার অশ্লীল কাজ থেকে হেফাজত করে। 'হায়া' (লজ্জা) শব্দটির উৎপত্তি হলো হায়াৎ (জীবন) থেকে। তাই তো নবী ﷺ বলেন,

الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ

"লজ্জা ঈমানের অংশ।"[৭৮]

মৃত অন্তরকে নির্লজ্জ অন্তর বলা হয়। আর নির্লজ্জতাকে অন্তরের কাঠিন্যতা বলা হয়। অন্তরের কাঠিন্যতা হলো আর্দ্রতার বিপরীত (অর্থাৎ শুষ্ক-হৃদয়, যা কান্না থেকে মুক্ত)। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যখন কোনো ব্যক্তি নির্লজ্জ ও রুক্ষ চেহারার অধিকারী হয়, তখন তার হৃদয়ে এমন কোনো প্রাণচাঞ্চল্য থাকে না, যার দ্বারা তার মধ্যে লজ্জা প্রকাশ পেতে পারে।

অন্তরের অন্যতম ব্যাধি হলো হিংসা-প্রবণতা।

হিংসা হল কারও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দেখে বিদ্বেষী হয়ে ওঠা এবং তা অপছন্দ করা। হিংসাকে আমরা দুভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. কারও প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আগত নেয়ামত দেখে অসন্তুষ্ট হওয়া; এটা নিন্দনীয় হিংসাপ্রবণতা বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যখন হিংসাকারী অন্তর্জ্বালার (কারণে নিয়ামত-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি) বিদ্বেষী হয়ে উঠবে তখন এটা আত্মার ব্যাধিতে পরিণত হবে।

২. কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখলে অপছন্দ করা। কারণ, সে ওই ব্যক্তির সমস্থানে বা তার চেয়ে বেশি এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। এটিও একধরনের হিংসা। আর এই প্রকারের হিংসাকে ঈর্ষাও বলা হয়ে থাকে।

বুখারী ও *মুসলিম*-এ ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমার ﷺ থেকে একটি হাদীস আছে, সেখানে নবী ﷺ এই প্রকার হিংসাকে গিবতাহ (ঈর্ষা) বলে ব্যক্ত করেছেন।

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ،

---

[৭৭] সূরা হা-মিম সিজদা, ৪১ : ৫

[৭৮] বুখারী, আস-সহীহ : ২৪

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

"কেবল দুটি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ;

১) সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তা বৈধ-পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন;

২) সে ব্যক্তির ওপর, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করে ও অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।"[৭৯]

আর ইবনে উমার ﷺ শব্দে হাদীসটি হলো,

لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

"শুধু দুই প্রকারের লোকই হিংসাযোগ্য :

১) যে লোককে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা হতে দিন-রাত আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করে।

২) যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে দিন-রাত এর বাস্তবায়নে নিযুক্ত থাকে।"[৮০]

সুতরাং এই হিংসা যার থেকে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন—তবে দুই জায়গা ব্যতীত—যাকে ঈর্ষা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রথম প্রকারের ঈর্ষা হলো : অন্যজন যে নেয়ামত অর্জন করেছে, সেটা সে পেতে ভালোবাসে, কিন্তু অন্যের কাছে সেই একই নেয়ামত পেতে দেখলে অসন্তুষ্ট হয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত পেতে ভালোবাসে, কিন্তু অন্যের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয় না, তখন এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে কোনো হিংসা নেই। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের ঈর্ষাটি মানুষকে জয়ী করার ক্ষেত্রে পরীক্ষা হিসেবে কাজ করে। আর এ প্রকারের ঈর্ষাকে মুনাফাসাহ বা প্রতিযোগিতা বলা হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগীই এটা অপছন্দ করে—তার থেকে অন্য কেউ এগিয়ে

[৭৯] বুখারী, আস-সহীহ : ৭৩

[৮০] তিরমিযী, আস-সুনান : ১৯৩৬; সহীহ।

যাক। এই ধরণের প্রতিযোগিতা সাধারণভাবে নিন্দনীয় নয়। বরং কল্যাণের কাজে এই ধরনের প্রতিযোগিতা প্রশংসনীয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

"ওই ব্যাপারে প্রতিযোগীরা যেন প্রতিযোগিতা করে।"[৮১]

সুতরাং প্রত্যেকে প্রতিযোগীর উচিত আখিরাতের নেয়ামত অর্জনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা এবং এটা কোনোভাবেই যেন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নেয়ামতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা না হয়—এই বক্তব্যটি নবী ﷺ-এর হাদীসের অনুগামী। কেননা নবী ﷺ হিংসা করতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষাকে বৈধ রেখেছেন—যাদের একজন হলো ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন অতঃপর সে এই ইলম অনুযায়ী আমল করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়; আরেকজন ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন। অতঃপর সে ওখান থেকে মুক্তহস্তে দান করে।

আল্লাহর নবী ﷺ (হাদীসের মধ্যে এই দুই প্রকার ব্যক্তিদের সাথে) মুজাহিদের কথা উল্লেখ করেননি; কেননা আত্মত্যাগ নিয়ে কেউ কখনও হিংসা করে না! কারণ মুজাহিদরা শারীরিকভাবে অনেক কষ্ট করে থাকে। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়কারীদের চেয়েও আল্লাহর পথে লড়াইরত মুজাহিদ অধিক উত্তম। এমনিভাবে আল্লাহর নবী ﷺ সালাত আদায়কারী, সিয়াম পালনকারী ও হাজীদের আলোচনার ক্ষেত্রে হাদীসটি আনেননি; কেননা এসকল ইবাদতের মাধ্যমে (ইবাদতকারী ব্যতীত) অন্যদের কোনো ব্যক্তিগত ফায়দা হয় না। ফলে এই শঙ্কাও থাকে না যে, লোকজন এসবের মাধ্যমে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে নেতৃত্বের আসনে বসাবে। অপরদিকে যা অর্জিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে শিক্ষাপ্রদান ও সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে।

হিংসার উৎপত্তি কেন হয়!?

মানুষের মধ্যে হিংসার উৎপত্তি হয় তখন, যখন সে অন্য কাউকে ক্রমাগত উন্নতি অথবা নেতৃত্ব অর্জন করতে দেখে। তাই তো আলেমদের মাঝে যাদের অনেক বেশি-সংখ্যক অনুসারী রয়েছে, তাদের মধ্যে হিংসার উপস্থিতি লক্ষ করা

[৮১] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৬

যায়; যেটা ওইসব আলেমদের মধ্যে পাওয়া যায় না, যাদের তেমন অনুসারী নেই। এমনিভাবে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের কারণে যে-সকল অনুসারী তৈরি হয়, সেসব দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও হিংসা পাওয়া যায়।

(আলেমদের অনুসারী তৈরি হয়) কেননা তারা অন্তরের খোরাক জুগিয়ে মানুষদের (আত্মিকভাবে) উপকৃত করেন। (অপরদিকে যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে) তাদেরও অনুসারী তৈরি হয়। কেননা তারা অর্থ-সম্পদ জোগান দিয়ে মানুষদের শারীরিকভাবে উপকৃত করেন। ফলে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তাআলা দুটি উপমা পেশ করেছেন। একটি উপমা দিয়েছেন প্রথম প্রকারের লোকদের জন্য আরেকটি উপমা প্রদান করেছেন দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّـهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ
وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

"আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের অধীনস্ত গোলামের, যে কোনো কিছুর ওপর শক্তি রাখে না। আর এমন একজন, যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক দিয়েছি। অতঃপর, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু মানুষই তা জানে না। আর আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন দু-ব্যক্তির—একজন বোবা, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না। সে মালিকের ওপর বোঝা। তাকে যেখানেই পাঠানো হয়, ভালো কিছু করে আসতে পারে না। সে কি ওই ব্যক্তির সমান, যে ন্যায়বিচারের আদেশ করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ পথের ওপর কায়েম রয়েছে?"[৮২]

আল্লাহ তাআলা এই দুটো উপমা নিজের পবিত্র মহিমান্বিত সত্তার জন্য এবং তিনি ছাড়া অন্য যে-সকল বস্তুর উপাসনা করা হয় তার জন্য উপস্থাপন করেছেন। কেননা প্রতিমাগুলো না কোনো উপকার করতে পারে, আর না

[৮২] সূরা নাহল, ১৬ : ৭৫-৭৬

অর্থবহ কোনো কথা উপস্থাপন করতে পারে! তাই তো আমরা দেখি—লোকজন আব্বাস ﵁-এর পরিবারকে সম্মান করতেন। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ মানুষদের শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করতেন। আর তার ভাই মানুষদের খাদ্য প্রদান করতেন। ফলে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। মুআবিয়া ﵁ লক্ষ করলেন—লোকজন ইবনে উমার ﵁-কে হাজ্জের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে এবং তিনি সেগুলোর জবাব দিয়ে চলেছেন। তখন তিনি (মুআবিয়া ﵁) বলে উঠলেন, আল্লাহর শপথ! এটাই হলো সম্মান!

এই তো গেল একটি ঘটনা। অন্যদিকে দেখা যায় উমার ইবনে খাত্তাব ﵁ ইসলামের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে আবু বকর ﵁-এর সাথে প্রতিযোগিতা করেছিলেন! এই ঘটনা উমার ইবনে খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা করার জন্য বললেন। তখন আমার নিকট অর্থকড়ি ছিল। আমি বললাম, যদি কখনও আবু বকরের ওপর বিজয়ী হতে চাই তা হলে আজকেই হতে হবে! তিনি বলেন, তারপর আমি আমার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে উপস্থিত হই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? আমি বললাম : সমপরিমাণই রেখে এসেছি। (এরপর দেখলাম) আবু বকর তার নিকট যা ছিল, তা নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ﵁-কে বললেন, পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি বললেন : তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

তখন (আমি মনে মনে) বললাম : কোনো দিক দিয়েই আমি তার সাথে কখনও জয়ী হতে পারব না।[৮৩]

সুতরাং উমার ﵁ এখানে যে কাজটা করেছেন এটা ছিল মূলত প্রতিযোগিতা এবং বৈধ ঈর্ষা। কিন্তু আবু বকর ﵁-এর অবস্থা ছিল সর্বোত্তম; কেননা তিনি প্রতিযোগিতার মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন, তিনি প্রতিযোগিতার নজরে কারও দিকে তাকাতেন না। তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ ﵁ এবং তার মতো আরও অনেকে ছিলেন যারা এই সকল প্রতিযোগিতামূলক কাজ থেকে মুক্ত ছিলেন। ফলে তারা ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে উঁচু স্তরের ছিলেন—যারা বিভিন্ন বিষয়

[৮৩] আবু দাউদ, আস-সুনান : ১৬৭৮; হাসান।

নিয়ে প্রতিযোগিতা করতেন এবং ঈর্ষা প্রকাশ করতেন—যদিও তাদের জন্য (নেক আমলের প্রতিযোগিতা ও নেক আমলকারীর আমল দেখে ঈর্ষা করার) বিষয়গুলো বৈধ ছিল।

আর তাই তো আবু উবাইদা ﷺ এই উম্মতের আমানতদার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কেননা কোনো আমানতদারের অন্তরে যদি (তার কাছে) আমানত রাখা বস্তুটার প্রতি কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা উঁকি না দেয়, তা হলে সে ওই ব্যক্তির চেয়ে আমানতের বেশি হকদার যার থেকে আমানত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

ইমাম আহমাদ ﷺ তার *মুসনাদ*-এ আনাস ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আনাস ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বসে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন এই পথ দিয়ে তোমাদের নিকট একজন জান্নাতি লোক আগমন করবে। তারপর একজর আনসারি সাহাবি আগমন করলেন; তার দাড়ি থেকে ওজুর পানি ঝরে পড়ছিল এবং জুতো-জোড়া তার বাম হাতে ছিল। এরপর তিনি সবাইকে সালাম দিলেন।

পরদিন নবী ﷺ পূর্বের কথাটি আবারও বললেন; ঠিক আবারও পূর্বের সাহাবিটি একই অবস্থায় আগমন করলেন! যখন তৃতীয় দিন আগমন করল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সেই একই ঘোষণা দিলেন এবং পূর্বের লোকটি একই অবস্থায় আগমন করলেন। যখন নবী ﷺ উঠে গেলেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﷺ লোকটির পিছু নিলেন। তিনি (ইবনে আমর ইবনে আস) বললেন, আমি আমার বাবার সাথে কথা বলেছি এবং কসম করেছি তিন দিন পর্যন্ত আমি তার নিকটে যাব না; যদি আপনি দেখেন তিন দিন শেষ হওয়ার আগেই আপনার নিকট এসেছি তখন যা ইচ্ছা তা-ই করবেন। তিনি বললেন : আচ্ছা ঠিক আছে!

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﷺ ওই লোকটির নিকট তিন রাত্রি অবস্থান করেছিলেন কিন্তু কোনো প্রকারের কিয়ামুল লাইলের ছিটেফোঁটাও দেখেননি। লোকটি শুধু ঘুম না এলে যখন বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেন তখন আল্লাহর যিকির করতেন। এভাবে ফজর পর্যন্ত চলত। আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তাকে কল্যাণকর বাক্য ছাড়া কোনো কিছুই উচ্চারণ করতে শুনিনি।

আমি যখন তিন দিন কাটিয়ে শেষ করলাম তখন তার আমলকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করলাম না। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা!

আমার মাঝে আর আমার বাবার মাঝে রাগারাগিও হয়নি এবং তাকে ছেড়েও চলে আসিনি। বরং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিন বার বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মাঝে এখন একজন জান্নাতি ব্যক্তি আগমন করবে। আর তিন বারই আপনি আগমন করলেন। তাই আমার প্রবল ইচ্ছা জাগল, আপনি কী আমল করেন তা দেখার। আমি ইচ্ছা পূরণ করলাম কিন্তু আপনাকে তো তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো আমলই করতে দেখলাম না।

আপনি এমন কী আমল করেন, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদের অধিকারী হলেন? তিনি জবাব দিলেন, তুমি যা দেখলে, এটাই সেই আমল! তবে এর সাথে এতটুকু করি যে, কোনো মুসলিমকে আল্লাহ তাআলা যেসব কল্যাণ দান করেছেন, সেসবের প্রতি আমার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও হিংসা-বিদ্বেষ রাখি না। তখন আবদুল্লাহ رضي الله عنه বললেন, তা হলে এটাই সেই আমল যা আপনাকে এত উঁচুতে পৌঁছে দিয়েছে, যেটা আমরা পালন করতে পারিনি।[৮৪]

এই গুণাবলির কারণেই আল্লাহ তাআলা আনসারদের প্রশংসা করে বলেছেন,

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, সে জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা-পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।"[৮৫]

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً (সে জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না)—মুফাসসিরগণ এই আয়াতের তাফসীর করেছে যে, মুহাজিরদের যা দান করা হয়েছে তার ব্যাপারে (আনসারদের মনে কোনো ধরনের) হিংসা ও ক্ষোভ পাওয়া যায় না!

আওস আর খাজরাজ গোত্রের মধ্যে দ্বীনি বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিযোগিতা

[৮৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১২৬৯৭; সহীহ।

[৮৫] সূরা হাশর, ৫৯ : ৯

চলত। তাদের একদল যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে অগ্রাধিকার পাওয়ার জন্য কোনো আমল করত, তখন অপরদল ওই একই আমল করতে ভালোবাসত।

আর নিন্দনীয় হিংসার পুরোটাই ইহুদীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই তো আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের হিংসার বর্ণনা দেন এভাবে,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

"সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে অনেকেই চায়—যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত!"[৮৬]

সুতরাং কেউ যদি এই হিংসা-মাফিক কাজ করে তা হলে সে নির্ঘাত জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হবে। এবং তাওবা না করা পর্যন্ত শাস্তির উপযুক্ত হয়ে থাকবে।

আর যার ব্যাপারে হিংসা করা হয়, সে তো মজলুম। সবর ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করাটা তার দায়িত্ব। এবং কোনো হিংসুক যদি তাকে কষ্ট দেয়, তখন সে ধৈর্যধারণ করবে এবং ক্ষমা করে দেবে।

ইউসুফ ﷺ তাঁর আপন ভাইদের হিংসার মুখোমুখি হন। ভাইয়েরা তাঁর ওপর অবিচার করে। তারা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা হিসেবে কূপে ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। যেন বণিকরা তাকে তুলে নিয়ে কাফিরদের দেশে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়, আর সে কাফিরদের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়।

এই বিশাল আলোচনা উপস্থাপনের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো এটা বোঝানো যে, অন্তরের রোগসমূহের মধ্যে হিংসাও একটি রোগ। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাধি। আর এর থেকে খুব কম লোকই রেহাই পায়। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে,

"কোনো ব্যক্তিই হিংসা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেটাকে প্রকাশ করে, আর সম্মানিত ব্যক্তি তা গোপন রাখে।"

কেউ যদি নিজের অন্তরে অন্যের প্রতি হিংসা আঁচ করতে পারে, তা হলে

[৮৬] সূরা বাকারা, ০২ : ১০৯

সে যেন এটাকে তাকওয়া আর সবরের মাধ্যমে মোকাবিলা করে। তবেই সে মন থেকে এটাকে ঘৃণা করতে পারবে। দ্বীনদারদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই কারও প্রতি হিংসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে না, কিন্তু ওই ব্যক্তির হকও যথাযথভাবে আদায় করে না। বরং কেউ যদি অন্যের ব্যাপারে নিন্দা করে, তা হলে এই দ্বীনদার শ্রেণীটা নিন্দুকের অপপ্রচারের সাথে তাল মিলায় না এবং নিন্দুকের প্রশংসাও করে না। কিন্তু কেউ যদি নিন্দুকের প্রশংসা করে, তখন তারা চুপ করে বসে থাকে। দ্বীনদার শ্রেণীটি এই নিন্দুকের বেলায় সৎকাজের আদেশ পরিহারের কারণে দায়বদ্ধ এবং (নিন্দার শিকার হওয়া ব্যক্তির বেলায়) শিথিলতা প্রদর্শনকারীও বটে। ফলে তারা অন্যদের হক নষ্ট করে এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখতে পারে না।

বলা হয়ে থাকে—যে তিনটা গুনাহ দ্বারা সর্বপ্রথম আল্লাহর নাফরমানি শুরু হয় (তা হলো),

১."হিরস" বা লোভ,

২."কিবর" বা অহংকার

৩."হাসাদ" বা হিংসা।

সুতরাং লোভের উৎপত্তি হয় আদম ﷺ থেকে, অহংকারের উৎপত্তি হয় ইবলিস থেকে আর হিংসার উৎপত্তি হয় কাবিল থেকে। কেননা সে হিংসাপরায়ণ হয়েই হাবিলকে হত্যা করেছিল। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

"তোমাদের আগেকার উম্মতদের রোগ তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হলো পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এই রোগ মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, চুল মুণ্ডন করে দেয়, বরং এটা দ্বীনকে মুণ্ডন (বিনাশ) করে দেয়।"[৮৭]

(নবী ﷺ এখানে হিংসা ও শত্রুতাকে) একপ্রকারের ব্যাধি বলে সম্বোধন করেছেন, যেমনিভাবে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসে কৃপণতাকেও একপ্রকারের ব্যাধি বলেছেন।

---

[৮৭] তিরমিযী, আস-সুনান : ২৫১০

রিসালাহ্-৮

وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

"কৃপণতার চেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি আর কী হতে পারে!"[৮৮]

জেনে রাখুন, এটা একটা রোগ। ওপরের দুটো হাদীসের প্রথমটিতে হিংসার পাশাপাশি শত্রুতার আলোচনা আনা হয়েছে। কেননা প্রাথমিকভাবে হিংসুক (হিংসার কারণে) কোনো ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহকে অপছন্দ করতে শুরু করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তা শত্রুতার রূপ নেয়। আর হিংসা মানুষকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে বিবরণ দিয়েছেন। যেভাবে হিংসুক অপর ব্যক্তির ওপর হিংসা করার কারণে সীমালঙ্ঘন করে, তারাও ঠিক সেভাবে একে অপরের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছিল।

সুতরাং কৃপণতা আর হিংসা এমন ব্যাধি, যা আত্মাকে তার উপকারী বস্তুর ব্যাপারে বিদ্বেষী করে তোলে। শুধু তাই নয় বরং আত্মার জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোকে প্রিয় করে তোলে। অথচ অন্তরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার জন্য। এটাই হলো ফিতরাত, যার ওপর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন। আর রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে এই ফিতরাতকে স্মরণ করিয়ে পূর্ণতা প্রদানের জন্য, পরিবর্তন করার জন্য নয়।

যখন কারও অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়, তখন সে আর এই ধরণের আত্মিক-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। সুতরাং মানুষের আত্মার সুস্থতা—ঈমানের মাধ্যমে, উপকারী জ্ঞান আর নেক আমলের মাধ্যমে ধরে রাখতে হবে। মুমিন যেন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের প্রতি গোপনে ও প্রকাশ্যে যত্নবান হয়, কেননা সালাত হলো দ্বীনের খুঁটি। আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি সামার্থ্য নেই (লা হাউলা ওয়া লা কুওয়াতাহ ইল্লা বিল্লাহ)—এ দুআটিই যেন তার মজবুত অবলম্বন হয়। কেননা এর মাধ্যমে অনেক বেশি ভার বহন করতে পারবে, বিপদ এলে লড়াই করতে পারবে, সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারবে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, আর তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে ইসলাম ও সুন্নাহর ওপর অবিচল রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ.

---

[৮৮] বুখারী, আস-সহীহ : ৩১৩৭

তাঁর সাথি, পরিবার-পরিজন, উম্মুল মুমিনীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে যারা তাঁকে অনুসরণ করবে, তাদের সকলের প্রতি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা আমর বিল-মারুফ ও নাহি আনিল-মুনকার ব্যাপকভাবে প্রচার করতে শুরু করলেন। শাসক থেকে প্রজা সকলের ওপর সমান প্রভাব ছিল এই ইমামের। এই রিসালাহটি ইমাম তখনকার সুলতানকে লেখেন, যেখানে তিনি তাকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ (আমর বিল-মারুফ ও নাহি আনিল-মুনকার) করার অনুরোধ জানান।

রিসালাহ-৯

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে মুসলিমদের সুলতানের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইবনে তাইমিয়্যার পক্ষ থেকে মুসলিমদের সুলতান ও মুমিনদের অভিভাবকের প্রতি—যিনি দ্বীনের ফরজসমূহ ও সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে উম্মতের মাঝে নবী ﷺ-এর প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এমনভাবে শক্তিশালী করুন, যাতে আপনি নিজের ও মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সংশোধন করতে পারেন এবং সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, এমনকি যেন ওই সকল শাসকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

> "তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।"[৮৯]

এবং আপনি যেন নবী ﷺ-এর এই সুসংবাদ-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্তও হতে পারেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ

---

[৮৯] সূরা হাজ্জ ২২:৪১

"যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তিনি তার ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। (যার মধ্যে একটি শ্রেণী হলো) ন্যায়পরায়ণ শাসক।"[৯০]

আল্লাহ তাআলা সুলতানকে-নিয়ে-করা এই দুআ কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা সুলতানের মধ্যে কল্যাণের এমন ধারা প্রবাহিত করুন, যার ব্যাপারে উম্মতের সবাই স্বীকৃতি দেবে। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সুলতানকে এক অনন্য মর্যাদা দান করুন, যা অন্য কাউকে দান করেননি।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে আপনিই সর্বাধিক মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে; আল্লাহ তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন : তিনি পৃথিবীতে অবশ্যই তাদেরকে খলিফা নির্বাচিত করবেন যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলিফা বানিয়েছেন।"[৯১]

সুলতানের সকল বিষয় তখনই কল্যাণকর হবে, যখন তিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবেন। এবং সকল মানুষকে ব্যাপকভাবে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা শাসকের অধীনস্তদের সংশোধন ও সংস্কার নিহিত রেখেছেন চারটি বস্তুর মধ্যে,

(১) সালাত কায়েম করা
(২) যাকাত আদায় করা
(৩) সৎকাজের আদেশ দেওয়া
(৪) এবং অসৎকাজের নিষেধ করা

সুতরাং তিনি যদি নিজে, তার দরবারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তার অধীনস্তদের সাথে নিয়ে যথাসময়ে জামাআতের সাথে সালাত কায়েম করেন

[৯০] বুখারী, আস-সহীহ : ৬৬০
[৯১] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৫৫

এবং জনসাধারণের জন্য এ ব্যাপারে নির্দেশ জারি করেন—যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অলসতা-প্রদর্শন করবে তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হবে—তা হলে শরীয়তের এই মূলনীতিটি বাস্তবায়িত হবে এবং পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছবে।

এর সাথে সাথে সুলতানকে আরও বেশি করে আল্লাহ-অভিমুখী হতে হবে। আর দিবসের শুরুতে আপনি যখন মুনাজাতে নিমগ্ন হবেন, তখন এই শব্দাবলি দ্বারা প্রার্থনা করবেন—

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

"হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তুমি ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। তোমার রহমতের ওসিলায় সাহায্য-প্রার্থনা করি।"

যদি করেন, তা হলে আল্লাহ তাআলা এমন ক্ষমতা (তামকীন) প্রদান করবেন, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। আমাদের মহতী সুলতান যে-সকল কল্যাণ এবং অনুগ্রহ সৃষ্টিজীবের প্রতি প্রদর্শন করে যাচ্ছেন, এগুলো মূলত যাকাত ও সাদাকার-ই অন্তর্ভুক্ত (বলে গণ্য হবে)। সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে দরিদ্রতা দূর করা, প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করা, মজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য করা, গরিবের জন্য দানের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দান করা। সৎকাজের আদেশ-প্রদান বলতে—আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যে আদল ও ইহসান বজায় রাখতে বলেছেন, তা বজায় রাখা; প্রাদেশিক নায়েব, প্রশাসক ও আমির-উমারাদের আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর হুকুম পালন এবং আল্লাহ-প্রদত্ত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া। অসৎকাজে নিষেধ করার অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলো নিষেধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা।

আমাদের মহতী সুলতান যখন এগিয়ে আসবেন, তখন আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে গোটা ইসলামি দুনিয়ায় তাকে সাহায্য করবেন। এর মধ্যে সুলতান ও সকল মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতের এত বিপুল পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে, যা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন।

আল্লাহ তাআলা যা ভালোবাসেন এবং যে বিষয়গুলোর ওপর তিনি সন্তুষ্ট, আপনাকে এমন কাজ করার তৌফিক দান করুন।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা নিজের জবান ও হাতের মাধ্যমে আমর বিল-মারুফ ও নাহি আনিল-মুনকার পালন করেন— যা আল্লাহ তাআলা ওয়াজিব করেছেন। পাশাপাশি আমর বিল-মারুফ ও নাহি আনিল-মুনকারের ধরণ-প্রকৃতি কেমন হবে, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং শর্ত কী কী, তা নিয়ে আলোচনা করেন। এবং কিছু ইশারা ও ইঙ্গিতের পাশাপাশি মূল্যবান জবাবও প্রদান করেন।

রিসালাহ-১০

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করে পত্র

সৎকাজের আদেশ প্রদান এই উম্মতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে ওই সকল গুণে গুণান্বিত করেছেন, যেগুলো দ্বারা তিনি নিজের প্রিয় নবী ﷺ-কে গুণান্বিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ

"তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির জন্য; তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করবে।"[১২]

এ জন্য আবু হুরাইরা كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَاسِ—আয়াত সম্পর্কে বলেন, বলেন,

خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوْا فِي الإِسْلَامِ.

"মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণকর তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে (আল্লাহর আনুগত্যের) শেকল লাগিয়ে নিয়ে আসে। অতঃপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে।"[১৩]

মুসলিমরা ছাড়া অন্যান্য জাতি যারা আছে, তারা সবাইকে সব রকমের কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয় না, সব ধরণের অসৎ-অশ্লীল কাজ থেকে

---

[১২] আল ইমরান, ০৩ : ১১০

[১৩] বুখারী, আস-সহীহ : ৪৫৫৭

নিষেধও করে না এবং এর ভিত্তিতে কারও সাথে লড়াইও করে না। প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ন্যায় ও অন্যায়ের ভিত্তিতে লড়াই করেছিল—যেমন : বানী ইসরাঈল জনগোষ্ঠী, তাদের লড়াইগুলো ছিল নিজেদের আবাসভূমি থেকে শত্রুবাহিনীকে হটানোর জন্য—তা কোনো প্রকার কল্যাণ ও হিদায়াতের উদ্দেশ্যে ছিল না।

এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই উম্মতের ইজমা হলো হুজ্জাত। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে!

মারুফ (সৎকাজ) বা মুনকার (অসৎকাজ)-এর পরিচয় :

অসৎকাজ হতে নিষেধ করার মানে হলো—অন্যায় হতে দেখলে শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা। ওলামায়ে কেরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শায়েখগণ হলেন উলূল-আমর। আর উলূল-আমরের জন্য অপরিহার্য হলো জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া আর অসৎকাজের নিষেধ করা। সুতরাং তারা জনসাধারণকে ইসলামের শরিয়ত-সম্মত বিষয়গুলোর আদেশ প্রদান করবে। যেমন : যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, ফরজ-ওয়াজিব সাদাকা ও যাকাত প্রদান করা, ফরজ সিয়াম পালন করা, বাইতুল্লাহর হাজ্জ আদায় করা; আর আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামত-দিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান আনয়ন করা; এবং দ্বীনকে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ করা, আল্লাহ তাআলার ওপরেই পূর্ণ ভরসা করা, আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা রাখা, তার শাস্তিরও ভয় করা, আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সবর করা, আল্লাহ তাআলার আদেশের কাছে নিজেকে সমর্পণ-করে-দেওয়া; এবং কথাবার্তায় সততা বজায় রাখা, ওয়াদা পূর্ণ করা এবং হকদার ব্যক্তিদের নিকট যথাযথভাবে আমানতসমূহ পৌঁছিয়ে দেওয়া।

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যেসব অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ জঘন্য কাজ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা। শিরকের ধরণ হলো, আল্লাহ তাআলার সাথে সূর্য, চন্দ্র, কোনো ফেরেশতা, কোনো নবী অথবা নেককারদের মধ্য থেকে কাউকে সার্বভৌম সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা।

আর অসৎকাজ হলো—আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন, যেমন : কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, মানুষের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে লুট করা, সুদ খাওয়া, জুয়া খেলা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, পিতা-মাতার সাথে রূঢ় আচরণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ শরীয়তের মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত করেননি, এমন ইবাদত প্রচলন করা।

আমর বিল-মারুফ ও নাহি আনিল-মুনকারের তাৎপর্য ও শর্তসমূহ :

বাস্তবতা হলো, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মের দিক থেকে উত্তম।"[১৪]

ফুযাইল ইবনে ইয়াজ ﷺ "উত্তম আমল"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, "উত্তম আমল হলো—ইখলাসপূর্ণ ও পদ্ধতি সঠিক হওয়া।

কোনো আমলে যদি ইখলাস থাকে কিন্তু পদ্ধতি সঠিক না হয়, তা হলে সেই আমল কবুল হবে না। যতক্ষণ-না সেটি ইখলাসের পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় করা হবে। ইখলাসের অর্থ হলো—আমলটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা। আর সঠিক হওয়ার অর্থ হলো—আমলটি সুন্নাহ মোতাবিক হওয়া।

এ জন্যই উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ দুআর মধ্যে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমার গোটা আমলকে আপনি সঠিক এবং ইখলাসপূর্ণ বানিয়ে দিন। আর এই আমলে আপনি ছাড়া আর অন্য কারও অংশ নির্ধারণ করবেন না।"

প্রতিটি সৎকর্মের উদ্দেশ্য যদি এটিই হয়, তা হলে সৎকাজের আদেশ-প্রদানকারী ও অসৎকাজের নিষেধকারীদের জীবনে সর্বপ্রথম তা বাস্তবায়ন করা উচিত। ইলম ও ফিকহ অনুযায়ী আদায় করা না হলে কারও আমলই সঠিক হবে না। এ কারণেই উমার ইবনে আবদুল আজীজ ﷺ বলতেন, "যে ব্যক্তি শরীয়তের জ্ঞান ছাড়াই আমল করবে, তার আমল সঠিক হওয়ার চেয়ে ভুলই বেশি হবে।"

---

[১৪] সূরা আল-মুলক, ৬৭ : ০২

মুআজ ইবনে জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,

وَهُوَ إِمَام الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ

"(ইলম) হলো আমলের ইমাম, আর আমল হলো ইলমের অনুসারী।"[১৫]

সুতরাং সৎকাজ ও অসৎকাজের ব্যাপারে অবশ্যই ইলম থাকতে হবে। অতঃপর এগুলোর মধ্যে পৃথক করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এমনকি যাদের প্রতি আদেশ-নিষেধ পৌঁছনো হবে, তাদের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। নবী ﷺ বলেন,

فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ

"বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সকল কাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ উঠে গেলে সকল কাজের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।"[১৬]

আর তাই নিশ্চয় (দাঈকে) দুঃখ-কষ্টে অত্যন্ত সহনশীল ও ধৈর্যশীল হতে হবে। কেননা তার (দাওয়ার পথে) অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। আর এ পথে সে যদি সহনশিলতা ও ধৈর্য-প্রদর্শন না করে, তবে তার দ্বারা সংশোধনের চেয়ে বিশৃঙ্খলাই বেশি সৃষ্টি হবে। যেমনিভাবে লুকমান ﷺ তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে,

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"(হে বৎস!) তুমি সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো এবং তোমার ওপর যে বিপদ পতিত হয় তাতে ধৈর্য ধরো; কেননা এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[১৭]

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনিভাবে শেষ নবীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১৫] ইবনে আবদিল বার্, জামিউ বায়ানিল ইলমি : ২১৩; মারফু।

[১৬] আবু দাউদ, আস-সুনান : ২৪৭৮

[১৭] লুকমান ৩১ : ১৭

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

"হে কম্বলাবৃত! উঠুন এবং সতর্ক করুন; আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন এবং আপনার পোশাকপরিচ্ছদ পবিত্র করুন; অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। আর অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দেবেন না এবং আপনার রবের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করুন।"[৯৮]

আল্লাহ তাআলা আয়াতগুলো শুরু করেছেন মানবজাতির কাছে "ভীতি-প্রদর্শন" করার মাধ্যমে, এবং শেষ করেছেন "ধৈর্যধারণ" এর নির্দেশ দিয়ে। আর ব্যক্তির প্রতি "ভীতি-প্রদর্শন" হলো—তাকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া, অসৎকাজের নিষেধ করা।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম—এর জন্য তিনটি বিষয় অর্জন করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

(১) ইলম

(২) বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ

(৩) ধৈর্য

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানের পূর্বে ইলম অর্জন করতে হবে।

(এ আদেশ-নিষেধের সময়) বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। (আর আদেশ-নিষেধ প্রদানের কারণে কোনো বিপদ এলে) ধৈর্যধারণ করতে হবে।

সালাফদের থেকেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। তারা বলতেন, দ্বীনের বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া কেউই সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ প্রদান করবে না। সে-ই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করবে, যার এ ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রয়েছে। আদেশ ও নিষেধ প্রদানের কাজটি সে-ই করবে, যার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ রয়েছে। যার মধ্যে সহনশিলতা ও ধৈর্যের গুণ রয়েছে, সে-ই আদেশ ও নিষেধ প্রদানের কাজে নিজেকে জড়িত করবে।

এ বিষয়টিও মনে রাখা দরকার, সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ

---

[৯৮] সূরা আল-মুদ্দাস্সির, ৭৪ : ১-৭

প্রদান করার ক্ষেত্রে (যেসব গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হলো), এই সকল গুণাবলির অর্জন করা করার বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। অনেকেই মনে করে—তার মধ্যে এই গুণগুলো নেই অথবা ঘাটতি রয়েছে। (তাই সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ প্রদানের কাজ ছেড়ে দেয়)। সুতরাং তার ভালো করে জেনে রাখা উচিত যে, ওয়াজিব পর্যায়ের আদেশ-প্রদানের কাজটি ছেড়ে দেওয়া গুনাহের কাজ। সুতরাং এক গুনাহ থেকে ফিরে গিয়ে আরেক গুনাহে লিপ্ত হওয়া আরও বড় ধরনের গুনাহ—এটা যেন সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচতে গিয়ে আগুনে ঝাপিয়ে পড়ার মতো।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ও আমাদের মধ্যে যে-সকল নিদর্শন দেখিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবের মধ্যে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন—তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যে, সমস্ত বিপদ-আপদের উৎস হচ্ছে পাপকাজ। আর সকল নিয়ামতের কারণ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি নূহ, আদ, সামূদ, লুত, আসহাবে মাদইয়ান এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়-সহ অন্যান্য পাপাচারী সম্প্রদায়কে কীভাবে আযাব দিয়ে পাকড়াও করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তাদের কী ধরনের শাস্তি দেবেন তা সূরা নাযিআত, মুজ্জাম্মিল, হাক্কাহ, কমার, গাফির-এ জানিয়ে দিয়েছেন।

যেহেতু কুফর, পাপাচার ও আল্লাহর অবাধ্যতা হলো সকল অনিষ্টতা ও সীমালঙ্ঘনের মূল; তো কোনো ব্যক্তি বা দল যদি গুনাহ করে, তখন অন্যান্যরা যদি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ-প্রদান করা থেকে বিরত থাকে, তা হলে এই পাপাচারের ভাগ তাদেরও জুটবে।

আবার কিছু লোক যদি (নিষিদ্ধ কর্ম থেকে) বাধা-প্রদান করতে গিয়ে অবৈধ-পন্থার আশ্রয় নেয়, তবে এটাও পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে নিজেদের মধ্যে তৈরি হবে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা, মতবিরোধ ও অনিষ্টতা। কী অতীত আর কী বর্তমান, এটাই হলো সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা ও অনিষ্টতা।

আর যারা গভীরভাবে বর্তমান সময়ের ফিতনাকে পর্যবেক্ষণ করবে নিঃসন্দেহে তাদের সামনে এর কারণ হিসেবে এটাই স্পষ্ট হবে। রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, উলামা-মাশায়েখগণ এবং তাদের উভয়ের অনুসারীদের পারস্পরিক মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, তার মূল কারণও এটি (বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ)।

মিশরে দীর্ঘ সফর শেষে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা দামেশকে ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি নিজেকে দরসে ব্যস্ত রাখেন। এসময় তিনি কিছু মাসআলায় নিজের ইজতিহাদ প্রকাশ করেন, ফলে হিংসুকদের হিংসা বেড়ে যায়। তারা ইমামের সাথে শত্রুতা শুরু করে। নানান কথা বলে ইমামের ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীকে বিষিয়ে তোলে। একপর্যায়ে ইমামকে দামেশকের কেল্লায় বন্দি করা হয়। কিন্তু ইমাম এতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়াননি বরং হাসিমুখে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তিনি বলেন, আমি এর প্রতীক্ষায় ছিলাম, নিশ্চয় এতে কল্যাণ আছে। তারা ইমামকে বন্দি করে সকল কিতাব সেখান থেকে সরিয়ে ফেলে। তিনি বন্দিশালায় বসে বসে "শাদ্দুর রিহাল"-এর মাসআলায় ইবনুল আখনায়ি মালিকির খণ্ডনের ব্যাপারে লেখালেখি করেন। এবং এখানে বসেই কুরআনুল কারীমের বেশকিছু অংশের তাফসীর লিখেন। ইমাম দামেশকের দুর্গে অবস্থিত এই বন্দিশালা থেকেই পত্রটি প্রেরণ করেন। আর এটিই ছিল তার জীবনের শেষ পত্র।

রিসালাহ-১১

ইবনে তাইমিয়্যার লেখা জীবনের শেষ চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা ও শোকর কেবল আল্লাহর জন্যই। আমি মহান রবের অগণিত নেয়ামতের মধ্যে রয়েছি, যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। আমার এই পত্রটি আপনাদের কাছে নিরাপদে পৌঁছাও একটি বিরাট নেয়ামত। কেননা আমার অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল এখান থেকেও কিছু প্রকাশিত হোক যেন আপনারা তা জানতে পারেন।

তারা চেয়েছিল (আখনাইয়্যা) রিসালাটা জনসাধারণের সামনে না আসুক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পুরোটা তাদের মাধ্যমেই জনসাধারণের সামনে নিয়ে এসেছেন এবং বিরুধীদেরকেও ওটার ব্যাপারে জানতে বাধ্য করেছেন।

এইসব মাসআলার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই জানত না। কিন্তু যেহেতু প্রকাশ হয়েই গেছে আর যারা প্রকাশ করেছে—এদের মধ্যে যাদের সদিচ্ছা ছিল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, আর যাদের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাদের সামনে (কিতাবটির মাধ্যমে) প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আমি এগুলো গোপন রাখার জন্য লেখিনি, যদিও সে আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়।

যে চিঠির মধ্যে আপনাদের প্রশ্নের জবাব লেখা হয়েছিল সেটা আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

আমি ভালো আছি, আর আমার চোখ দুটিও এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো। আমরা আল্লাহ তাআলার অশেষ নেয়ামতে প্রতিনিয়ত ডুবে আছি, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। সকল প্রশংসা একমাত্র পবিত্র ও বরকতময়

আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ তাআলা যে ফয়সালা করেন তার মধ্যেই কল্যাণ, রহমত ও হিকমা নিহিত রয়েছে।

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"নিশ্চয় আমার রব যা চান, তা নিপুণভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।"[৯৯]

[*চিঠির উপরিউক্ত অংশটুকু লেখার পরেই ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার নিকট কলম-কালির সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পত্রের বাকি অংশ কয়লা দিয়ে লিখে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট প্রেরণ করেন তিনি। এটাই ছিল তার জীবনের সর্বশেষ চিঠি। এই মহতি ইমাম জীবনের শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন কারাগারের চার দেয়ালের মাঝেই।*]

আপনাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল করুন।

সকল প্রশংসা ও শোকর আল্লাহ তাআলার জন্য, আমি বিরাট নেয়ামতে অবস্থান করছি। আল্লহ তাআলা এ ব্যাপারে যা-কিছুই সংঘটিত করছেন এসব ইসলামের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

"তিনি ওই সত্তা যিনি হিদায়াত ও সত্য দ্বীন-সহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সকল দ্বীনের ওপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"[১০০]

আল্লাহ তাআলার নীতি হলো : যখন তিনি তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে চান তখন এর প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর কালিমাসমূহের মাধ্যমে হককে প্রতিষ্ঠিত করেন। হকের মাধ্যমে বাতিলের ওপর আঘাত হানেন ফলে হক বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে, আর তখন বাতিল নিঃশেষ হয়ে যায়। শয়তানের অনুসারীরা যে ব্যাপারে অপতৎপরতা চালিয়েছিল সেটা শুধু নবী ﷺ-এর শরীয়তের বিরুধিতাই ছিল না বরং ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও খাতামুন নাবিয়্যীন-সহ সকল নবী-রাসূলদের শরীয়তের বিরুধিতা ছিল।

[৯৯] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০০
[১০০] সূরা তাওবা, ৯ : ৩৩

তারা চেয়েছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীদের কোনো বক্তব্য এবং লেখনী যেন প্রকাশিত না হয়। তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যেন (আখনাইয়্যা) পুস্তিকাটা প্রকাশিত না হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে এর কয়েকগুণ বেশি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পুস্তিকাটির খুঁত ধরা কিন্তু উলটো এটা তাদেরই বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বীন ও শরীয়তের বেলায় তারা আমাদের কোনো খুঁতই ধরতে পারেনি। কিন্তু তাদের শেষ অস্ত্র ছিল—আমার বক্তব্যটা কিছু মানুষের[১০১] রাষ্ট্রীয়-ফরমানের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কিন্তু সে মানুষ যে-ই হোক না কেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীতে গিয়ে তার কোনো বিষয়ে সাড়া দেওয়া (আমার পক্ষে) সম্ভব নয়, বরং সেটা কোনোভাবেই জায়েজ নয়।

তবে অনেকে অভিযোগ করে বলে, আমি নাকি বিদআত ছড়িয়েছি। কিন্তু এ কথা দূরদর্শীদের কাছে নিতান্তই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে এবং বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারবে বিষয়টা কতটুকু উলটো। তবে যাই হোক, বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

"কিছুকাল পরই তোমরা এর সংবাদ অবশ্যই জানবে।"[১০২]

তারা দাবি তুলছে, আখনাইয়্যা পুরোটা উপস্থাপন করা হোক। অথচ তাদের কাছেই এর দ্বিগুণ কিতাব মজুদ আছে এবং এর চেয়ে শক্তিশালী ফিকহ বিদ্যমান রয়েছে। আসলে তারা যেটা করেছে, এটা তাদের অজ্ঞতার পরিচয়। মূলত তারা এক অজানা স্থানে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে বিষয়টা তাদের কাছে ধারণার চেয়ে আরও বেশি জটিল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার পথে বিরাট জিহাদে শরীক রয়েছি। এখানে আমাদের লড়াইটা ইয়াওমুল কাযান, জিবিল্লিয়্যা, জাহমিয়্যা, ইত্তিহাদিয়্যা-সহ এ জাতীয় দলের সাথে লড়াইয়ের মতোই।

আর এটা আমাদের ওপর এবং মানুষদের ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটি নেয়ামত কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

---

[১০১] কিছু মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য সুলতান কালাউন।

[১০২] সূরা সদ, ৩৮ : ৮৮

পাঠকের পাতা

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১) সালাত : নবিজির শেষ আদেশ, শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

২) কারাগারের চিঠি, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা

৩) আস সারিমুল মাসলুল, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১) মিল্লাতু ইবরাহীম, শাইখ আবু মুহাম্মাদ

২) মুখতাসার আল ফাওয়ায়েদ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম

৩) আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে, শাইখ ড. নাজীহ ইবরাহীম

৪) কোয়ান্টাম মেথড, মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

৫) মুর্জিয়াদের সংশয় নিরসন, শাইখ আবু মুহাম্মাদ

৬) মাইলস্টোন, সাইয়্যেদ কুতুব

৭) দাওয়াতী কাজে মনোবিজ্ঞান, শাইখ আব্দুল্লাহ আল খাতির

৮) মিউজিক : অন্তরের মদ, শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

৯) আসহাবুল উখদুদের ঘটনা, শাইখ রিফায়ী সুরুর

১০) ইসলামি আকীদা, শাইখ আবু মুহাম্মাদ

“ঈমানদারদের ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয়—তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ এবং পাপকে মোচন করার জন্য। কারণ, ঈমানদারগণ তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ করেন কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; আর তাই জীবনে সহ্য-করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়া আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।”

— ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ﷺ

[মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৮/২৯১-৩০৫]

❝ আমার শত্রুরা আমার কীই-বা ক্ষতি করতে পারবে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে। আমি যেখানেই যাই সেটা তো আমার সাথে থাকে, আমার থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। কারাগার আমার ইবাদাতের জন্য নির্জন আশ্রয়স্থল। মৃত্যুদণ্ড আমার জন্য শাহাদাতের সুযোগ। আর দেশ থেকে নির্বাসন হচ্ছে আমার জন্য এক আধ্যাত্মিক ভ্রমণ। ❞

— ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা ﵀